

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মেহেরুন নেছা

রোলঃ 23090120177

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মেহেরুন নেছা

রোলঃ 23090120177

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “সেকুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ” বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মেহেরুন নেছা, আইডিঃ 23090120177 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেহেরুন নেছা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

মেহেরুন নেছা

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120177

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....	5
১.১ বিষয় পরিচিতি	5
১.২ গবেষণার মূল যুক্তি.....	6
১.৩ সমস্যার বিবৃতি	6
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্ন	7
১.৫ গবেষণার গুরুত্ব	7
১.৬ উপসংহার	7
অধ্যায় ২: ইসলাম: সর্বব্যাপী জীবনব্যবস্থা.....	8
২.১ ইসলামের মৌলিক ধারণা:.....	8
২.২ দ্বীন ও এর ব্যাপকতা:	10
২.৩ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা:	14
২.৪ ধর্ম ও রাষ্ট্র: ইসলামী দৃষ্টিকোণ	16
অধ্যায় ৩: সেকুলারিজম	19
৩.১ সেকুলারিজমের ধারণা ও সংজ্ঞা :	19
৩.২ ঐতিহাসিক পটভূমি:.....	22
৩.৩ সেকুলারিজমের প্রকারভেদ:.....	26
৩.৪ সেকুলারিজমের মূলনীতি:.....	28
অধ্যায় ৪: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখা : এক বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ.....	31
৪.১ ইসলাম বনাম সেকুলারিজম:.....	31
৪.২ মুসলিম সমাজের সেকুলার প্রভাবের অনুপ্রবেশ:.....	37
৪.৩ সেকুলারিজমের ইসলামীকরণ: মুসলিম সমাজে এক নীরব রূপান্তর.....	42

৪.৪ সেকুলারিস্ট মুসলিম	45
৪.৫ সেকুলার বনাম ধার্মিক	49
অধ্যায় ৫: ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধারের পথ	50
অধ্যায় ৬: সেকুলারিজমের এই ফিতনাতে মুসলিমদের করণীয়:.....	55
অধ্যায় ৭: উপসংহার	57

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ বিষয় পরিচিতি

বর্তমান বিশ্বে “সেক্যুলারিজম” শব্দটি এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে যেন এটি অগ্রগতির একমাত্র পথ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই সহনশীলতা, যুক্তিবাদ ও আধুনিকতা। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ধারণা এক সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের মাধ্যমে ধর্মকে ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। অর্থাৎ, মানুষ তার ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানে ধর্মের বিশ্বাস রাখতে পারে, কিন্তু সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে সেই বিশ্বাসের কোনো স্থান থাকবে না — এটিই সেক্যুলারিজমের মূল কার্যকর দিক।

ইসলামের দৃষ্টিতে, ধর্ম কোনো ব্যক্তিগত ‘বিশ্বাসের বিষয়’ নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামী দ্বীন মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে — আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক — এক অভিন্ন সত্তায় সংযুক্ত করে। ফলে, ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। একদিকে সেক্যুলারিজম রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ধর্মকে অপসারণ করতে চায়, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামী খেলাফতের সর্বশেষ দেশ তুরস্ক। মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমা মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে যাকে পরাস্ত করেছিলেন। তিনি তুরস্কের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকে তার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি থেকে ভেড়ার চামড়া ছড়ানোর মতো আলাদা করেছিলেন। তিনি এমন এক সেকুলার সংবিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা জীবন থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। এর ভিত্তিতে এমন সব আইন প্রণীত হয়েছিল যেগুলো পরিপূর্ণ ইসলাম বিরোধী এমন কি পারিবারিক ও ব্যক্তি সম্পর্কিত আইনও। অর্থাৎ ইসলামকে জনজীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তবে শুধু ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের অন্তরে এর প্রভাব রাখতে পারবে। এভাবে একটি সরকারি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ইসলাম-যা মূলত ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ের সমষ্টি - তা একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

১.২ গবেষণার মূল যুক্তি

এই গবেষণার মূল বক্তব্য হলো — সেক্যুলারিজম কেবল ইসলামের বিপরীতে নয়, বরং এটি দ্বীনকে “অকার্যকর” ও “ব্যক্তিগত” করে তোলার একটি প্রণালী। শুধু ইসলামই নয় সকল ধর্মকেই ব্যক্তিগত করে এটি। এর মাধ্যমে ধর্ম তার সামষ্টিক শক্তি, নৈতিক কর্তৃত্ব ও নীতিনির্ধারণী ক্ষমতা হারায়। ফলে ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, আর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সম্পূর্ণভাবে মানবকেন্দ্রিক ও নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নীতির ওপর।

পশ্চিমে সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি ঘটেছিল ধর্মীয় কর্তৃত্বের অপব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, কিন্তু মুসলিম সমাজে এটি সরাসরি সেই প্রেক্ষাপট ছাড়াই আমদানি করা হয়েছে — উপনিবেশবাদ, আধুনিক শিক্ষা ও পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের মাধ্যমে। এতে ইসলামি সভ্যতা থেকে সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা আলাদা হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকেই বলা যায় ‘দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ’।

১.৩ সমস্যার বিবৃতি

বাংলাদেশসহ বহু মুসলিম সমাজে সেক্যুলারিজম এখন এমন এক মানসিক কাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে ধর্মকে বলা হয় “ব্যক্তিগত পছন্দ” — নামাজ, রোজা, দান, বা ব্যক্তিগত নৈতিকতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষা, আইন, কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মের কোনো ভূমিকা থাকবে না — এই ধারণাই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

ফলে মুসলিমদের মধ্যে দ্বৈততা তৈরি হয়েছে: ব্যক্তিগত জীবনে তারা ধর্মাচার পালন করে, কিন্তু সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সেক্যুলার নীতির অনুসারী হয়। এই দ্বৈততা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ”

— “হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ কর।” (সূরা আল-বাকারাহ ২:২০৮)

অর্থাৎ, ইসলাম আংশিক নয়; এটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। কিন্তু সেক্যুলারিজম এই পূর্ণাঙ্গতাকে ভেঙে দেয়, এবং বিশ্বাসকে সীমিত করে আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্ন

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো —

সেক্যুলারিজম কীভাবে মুসলিম সমাজে দ্বীন ইসলামকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, এবং এর ফলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কীভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তা বিশ্লেষণ করা।

মূল গবেষণা প্রশ্ন:

1. সেক্যুলারিজম কীভাবে দ্বীনকে “ব্যক্তিগত” পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখে?
2. এই ধারণা মুসলিম সমাজে কীভাবে প্রবেশ করেছে এবং প্রভাব ফেলেছে?
3. কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে ধর্মকে ব্যক্তিগত করা কতটা গ্রহণযোগ্য?
4. সেক্যুলার শিক্ষা ও মিডিয়া এই প্রক্রিয়ায় কী ভূমিকা রাখছে?
5. ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এ ফাঁদ থেকে উত্তরণের পথ কী?

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণাটি ইসলামি চিন্তাধারায় “দ্বীন” ও “দুনিয়া”-র সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণে সাহায্য করবে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে “সেক্যুলারিজম” একটি নিরপেক্ষ ও মানবিক ধারণা হিসেবে উপস্থাপিত হলেও, এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য — সমাজকে ধর্মহীন করা, পশ্চিমা দাসত্বে বন্ধী রাখা — তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এই গবেষণার ফলাফল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নীতিনির্ধারণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

১.৭ উপসংহার

সেক্যুলারিজমের দাবিকৃত নিরপেক্ষতা আসলে একটি ছদ্ম নিরপেক্ষতা। এটি একদিকে ধর্মের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, অন্যদিকে ধর্মকে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে মানুষ ধর্ম পালন করলেও, সমাজ চলে ধর্মহীনতার দিকে। এই অবস্থাকে ইসলামি দৃষ্টিকোণে এক ধরনের “দ্বীনি জাল” বলা যায়, যেখানে বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে কিন্তু জীবনব্যবস্থা হারিয়ে যায়।

অতএব, ইসলামী সমাজের জন্য জরুরি হলো — সেক্যুলারিজমের এই ফাঁদকে চিনতে পারা এবং ইসলামকে আবার পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

এই গবেষণা সেই চিন্তাকে তাত্ত্বিক ও বাস্তব উভয় দিক থেকে বিশ্লেষণ করবে।

অধ্যায় ২: ইসলাম: সর্বব্যাপী জীবনব্যবস্থা

২.১ ইসলামের মৌলিক ধারণা:

“ইসলাম” শব্দটি আরবি “সালাম” (سلام) শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, ও আত্মসমর্পণ। ধর্মীয় পরিভাষায় ইসলাম মানে হলো —

আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

অর্থাৎ মানুষ নিজের ইচ্ছা, অহংকার ও কামনাকে ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে — এটাই ইসলামের মূল কথা। আমরা যে ইসলামে বিশ্বাস করি, যার দাওয়াত দিই, যাকে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির পথ বলে মনে করি, তা হলো সেই দ্বীন, যা সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন। যাকে নাযিল করেছেন তার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহতালা কর্তৃক মনোনীত পদ্ধতি হলো ইসলাম। ইসলামের মূল স্তম্ভ ৫টি।

ক. ইসলাম প্রথমত ও প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে ঈমানের ওপর, যা ব্যক্তির সফলতা ও সমাজের সুখের মূল। ঈমান হলো আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাব এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের সমষ্টি।

খ. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনা এবং তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দান করার পর ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। এটা আল্লাহ পাকের জন্য খাস একটি ইবাদত।

কোরআন শরীফের পঞ্চাশটিরও বেশি আয়াতে এবং নবীজীর শতাধিক হাদীসে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায়ের উপর জোর তগিদ দেয়া হয়েছে। নামাযকে দ্বীনের খুঁটি এবং ইসলামের বুনিয়াদরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।

(বাকারা ২:৪৩)

গ. ইসলামের বুনিয়াদি ও মৌলিক শিক্ষাগুলোর মধ্যে কালিমা ও নামাযের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত ইসলামের তৃতীয় রোকন বা খুঁটি। যে মুসলমানের নিকট নির্ধারিত পরিমাণ ধনদৌলত থাকবে, সে প্রতিবছর হিসাব করে সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ গরিব-মিসকীনকে দিয়ে দিবে।

কোরআন শরীফের বহু জায়গায় নামাযের সঙ্গে যাকাতের কথা এসেছে। আল্লাহ বার বার বলেছেন, ‘নামায পড়ো, যাকাত দাও।’ কয়েকটি আয়াতে তো নামায ও যাকাতকে মুমিন-মুসলমানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলেও উল্লেখ করা হয়েছে,

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

(মুত্তাকী মুসলমান তারা) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে।

সূরা ২৭, আয়াত ৩

বোঝাগেল, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, সে প্রকৃত মুসলমান নয়। কেননা প্রকৃত মুসলমানের ভেতর যে গুণাবলী থাকা উচিত, তার মাঝে সেই গুণাবলী নেই। মোটকথা নামায না পড়া যেমন কাফের-মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য; মুমিন মুসলমানের নয়, তেমনি যাকাত আদায় না করাও কাফের মুশরিকের বৈশিষ্ট্য; মুত্তাকী মুসলমানের নয়।

ঘ. ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাগুলোর মাঝে কালিমা, নামায ও যাকাতের পর রোযার অবস্থান। আল্লাহ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা রাখা ফরজ যেমন ফরজ ছিলো তোমাদের
পূর্ববর্তীদের উপর। সূরা বাকারা ২/১৮৩

পুরো রমজান মাস রোযা রাখা ফরজ। যে ব্যক্তি বিশেষ অপরাগতা বা অক্ষমতা ব্যতীত
রমজানের একটি রোযাও ছেড়ে দিবে সে কঠিন গোনাহগার হবে। একটি হাদীসে এসেছে,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَقِيَ اللَّهَ بِهِ، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ
لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ.

যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ কোনো ওজর ব্যতীত রমজানের একটি রোযাও তরক করলো, সে
যদি তদস্থলে সারাজীবনও রোযা রাখে, তবু (রমযানের ঐ একটি রোযার হক আদায় হবে
না।) সে আল্লাহর সামনে এমনভাবে হাজির হবে যে, আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন বা শাস্তি
দিবেন। মুজামে কাবীর, ৯৫৭৪

ঙ.ইসলামের সর্বশেষ স্তম্ভটি হচ্ছে হজ্জ। এটি ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ
তায়াল্লা বলেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

যারা কাবা ঘরে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্ব করা ফরজ।
আর কেউ তা পালন করতে অস্বীকার করলে করুণক আল্লাহর তাতে কিছু আসবে যাবে না।
আল্লাহ সমস্ত জগতবাসী হতে অমুখাপেক্ষী। সূরা আলে ইমরান ৩/৯৭

আয়াতটিতে হজ্ব ফরজ হওয়ার ঘোষণা রয়েছে। হজ্ব শুধু সামর্থ্যবান লোকদের উপরই ফরজ
এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে, আর আয়াতের শেষ অংশে ইরশাদ হয়েছে, হজ্ব করার শক্তি-সামর্থ্য
থাকার পরও আজকাল অনেক ধনী যারা হজ্ব করে না, তাদের এই অন্যায় আচরণে আল্লাহ
পাকের কোনো ক্ষতি হয় না। আল্লাহ তো মুখাপেক্ষিতার দোষ থেকে মুক্ত, চির অনপেক্ষ।

২.২ দ্বীন ও এর ব্যাপকতা:

দ্বীন একটি আরবি শব্দ যার অর্থ ধর্ম বা জীবনযাপনের পথ। ইসলাম ধর্মে, এটি শুধুমাত্র
বিশ্বাস বা উপাসনাকেই বোঝায় না, বরং এটি একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা
ঐশ্বরিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, যার মধ্যে বিশ্বাস, নীতিশাস্ত্র, মূল্যবোধ এবং কর্মের সব
দিক অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম, কারণ এটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম"
(সূরা আলে ইমরান: ১৯)।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। আকিদা, ইবাদত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষাসহ মানব জীবনের সবকিছু এই ধর্মের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। ইসলাম ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়।

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরকালের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।’ (সূরা মায়িদা-৩)

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ মানব জীবনের সব বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং বিধিবিধান রয়েছে। ফেকাহ শাস্ত্রে খুঁটিনাটি সব কিছুর বিস্তারিত আলোচনা আছে। এর কিছু মান্য করা, কিছুকে অস্বীকার করা কুফরি। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

‘তবে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো এবং কিছু অংশ অস্বীকার করো? তাহলে বলো, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আজাবের দিকে? তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।’ (সূরা বাকারা-৮৫)

ইসলাম-পূর্ব আসমানি ধর্মগুলো সারা পৃথিবীর জন্য এবং সব যুগের জন্য ছিল না। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেগুলোতে জীবনের সব বিষয়ের সমাধান নেই এবং সেগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু ইসলাম এর ব্যতিক্রম। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ দ্বীন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি একমাত্র এ ধর্মের মাঝে নিহিত।

ইসলাম মানবধর্ম। জাতি-ধর্ম বংশ-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সৌজন্যমূলক আচরণ, জীবের প্রতি দয়া এই ধর্মের অন্যতম শিক্ষা।

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে

‘হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।’ (সূরা নিসা-৫৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

‘নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য সম্বলিত কিতাব নাজিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পারো। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন করো না।’ (সূরা নিসা- ১০৫)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, ‘হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যারা মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন না।’ (সহিহ মুসলিম-৬১৭২)

একবার নবীজী দ্বীনের পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা। কথাটি নবীজী তিনবার বললেন। আমরা আরজ করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) কার প্রতি কল্যাণ কামনা? নবীজী বললেন, আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের প্রতি, মুসলমানদের শাসক ও মুসলিম জনসাধারণের প্রতি। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬

এই পরিচয়কে আরও সংক্ষেপে এভাবে বলা হয় যে, দুটি হক আদায়ের নাম ইসলাম, একটি আল্লাহর হক অপরটি বান্দার হক।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হাবশা দেশের বাদশা আসহামা নাজাশী প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাদের কোন সে দ্বীন, যাকে কেন্দ্র করে তোমরা তোমাদের কওমকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছো এবং অন্য কোনো জাতির প্রচলিত ধর্মেও প্রবেশ করতে পারোনি? জাফর ইবনে আবি তালেব তখন দারাজ কণ্ঠে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরলেন এভাবে,

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجَوَارِ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا: إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِنُوجِدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحَجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجَوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالِدِمَاءِ. وَنَهَانَا عَنْ: الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِمَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ... فَصَدَّقْنَاهُ وَأَمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحَلَّلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا

হে মহান বাদশা! আমরা ছিলাম মূর্থতা ও বর্বরতায় অভ্যস্ত এক জাতি। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মরা-পঁচা খেতাম, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ করে বেড়াতাম, রক্তের সম্পর্কও বিনষ্ট করতাম, প্রতিবেশীর ক্ষতি করতাম, আমাদের সবলেরা দুর্বলের গ্রাস কেড়ে খেতো। এসবই ছিলো আমাদের আগের ধর্ম-কর্ম। অনন্তর আল্লাহ আমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন, যার জাত-বংশ আমাদের চেনা, যার সততা ও বিশ্বস্ততা সবার জানা, যার চরিত্রের শুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা আশ্বস্ত। তিনি আমাদের ডাকলেন আল্লাহর প্রতি, আমরা যেন আল্লাহকে এক মানি, তাঁর উপাসনা করি, আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহকে ছেড়ে যেসব পাথর ও মূর্তির উপাসনা করতাম তা যেন আমরা ছেড়ে দিই। সাথে সাথে তিনি আমাদেরকে সত্যবাদিতার হুকুম করলেন; আমানত ফিরিয়ে দেওয়া, আত্মীয়তা রক্ষা করা এবং প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনার আদেশ দিলেন; নিষিদ্ধ কাজ এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। বেহায়াপনা ও বেলেগ্লাপনা থেকে নিষেধ করলেন; মিথ্যা বলা, এতিম-অসহায়ের মাল লুটে নেওয়া এবং সতী নারীর উপর অপবাদ দেওয়া থেকে বারণ করলেন। আদেশ করলেন আমরা যেন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করি। আমাদেরকে নামায, যাকাত ও রোজা আদায়ের হুকুম করলেন।... আমরা তাঁকে সত্যায়ন করলাম, তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম, তাঁর আনীত সকল বিষয়ে আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম। তাই আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করি না। তিনি আমাদের উপর যা হারাম করেছেন তাকে আমরা হারাম জানি, যা কিছু হালাল করেছেন তাকে আমরা হালাল মানি।

মুসনাদে আহমদ, ১৭৪০

রোম-সরাট হিরাক্লিয়াস কুরাইশ সর্দার আবু সুফয়ানের নিকট জানতে চাইলেন, নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের কী আদেশ করে থাকেন? আবু সুফয়ান তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি বললেন,

يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে থাকেন, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করো না। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা এ-বিষয়ে যা বলে তা ছেড়ে দাও। তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে, যাকাত দিতে, সত্য বলতে, স্খলিতা রক্ষা করতে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখতে আদেশ করেন। সহীহ বোখারী ৭

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইসলাম এমন একটি দ্বীন, যা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে তার সৃষ্টির কাছে প্রেরণ করেছেন। আর মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ তা‘আলা যে দ্বীনসহ সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন, তা হচ্ছে ইসলাম, যা পরিপূর্ণ, জীবনের সকল দিক ও বিভাগ যার অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যাপক, স্থায়ী এবং নির্ভেজাল।

এ দ্বীন ব্যাপক, কেননা তা সমগ্র জগতের এবং সমস্ত মানুষের জন্য রহমত।

তা স্থায়ী, কেননা তা ক্রিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

তা নির্ভেজাল, কেননা আল্লাহ তা‘আলা নিজে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অতএব, এ দ্বীন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে নিরাপদ।

২.৩ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা:

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র-ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক-ইসলাম সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য এমন একটি জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন, যা পৃথিবীর যেকোনো যুগ ও পরিবেশে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর।

ব্যক্তিজীবনে ইসলাম:

ইসলাম একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে গাইডলাইন দিয়েছে। জন্ম, নাম রাখা, আদব-কায়দা শেখানো, শিক্ষা, শিষ্টাচার, ন্যায়-অন্যায়, পবিত্রতা, ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হালাল-হারামের পার্থক্য, আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা ইসলাম ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে।

পারিবারিক জীবনে ইসলাম:

ইসলাম পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে। পিতামাতা, স্ত্রী-স্বামী, সন্তান-সন্ততি, ভাইবোন-সবার জন্য ইসলাম নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিবাহ ও তালাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সংগত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

সামাজিক জীবন:

সামাজিক জীবনে ইসলামের শিক্ষা হলো শান্তি, সহনশীলতা, দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। প্রতিবেশীর অধিকার, অসহায়দের সহায়তা, সমাজের দুর্বল শ্রেণির কল্যাণ, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং সততার সাথে জীবনযাপন-এসবই ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে ইসলাম সকল প্রকার অন্যায়, দুর্নীতি, মিথ্যা ও প্রতারণাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

অর্থনৈতিক দিক:

ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়, যেখানে সম্পদের সুষম বণ্টন ও ধনীদের উপর দরিদ্রদের হক নিশ্চিত করা হয়। জাকাত, সদকা, সুদ নিষিদ্ধকরণ, ব্যবসায় ন্যায্যতা এবং শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ইসলাম একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে।

রাজনৈতিক ও আইনি দিক

ইসলাম ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থার কথা বলে। একজন শাসকের দায়িত্ব হলো জনগণের কল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামic শাসনব্যবস্থায় আইন ও বিচার ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই। সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুবিচার ইসলামের মূলনীতি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির পথই দেখায় না, বরং পার্থিব জীবনেও শান্তি, স্থিতি ও উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। একজন মুসলমান যখন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান মেনে চলে, তখন সে কেবল একজন ধার্মিক ব্যক্তি নয়, বরং সমাজের জন্যও একজন দায়িত্বশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই বলা যায়, ইসলাম শুধু নামাজ, রোজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোর দিশা।

২.৪ ধর্ম ও রাষ্ট্র: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। বরং রাষ্ট্র ইসলামি মূল্যবোধের ধারক ও বাহক।

ইসলামে ধর্ম (দীন) কেবল কিছু ইবাদত, রীতি বা ব্যক্তিগত নৈতিকতা নয়; বরং এটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা — ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা ইসলামে সকল কিছুই নির্দিষ্ট মানদণ্ড মোতাবেক পরিচালিত হয়। মানদণ্ডগুলো কোন মানব রচিত মনগড়া ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়নি, বরং এগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে কুরআন-সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াস এর মাধ্যমে। সেগুলো মেনে চলার মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়, শান্তি, শৃঙ্খলা এবং আল্লাহর নির্দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব, ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা দুটি সত্তা নয়; বরং ইসলাম হলো সেই মানদণ্ড যার মাধ্যমে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে একে অপরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

ইসলামে রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব তিনটি স্তরে দেখা যায়—

1. আকীদা রক্ষা করা – অর্থাৎ তাওহীদ ও ইসলামী জীবনদর্শনের সুরক্ষা।

ইসলাম প্রথমত ও প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে ঈমানের উপর যা ব্যক্তির সফলতা ও সমাজের সুখের মূল। ঈমান হল আল্লাহ তার ফেরেশতা তার কিতাব ও রসূল এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের সমষ্টি। এই বিশ্বাসের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে তাওহীদের মাধ্যমে। এটাই প্রত্যেক রসূলের বার্তা ছিল। তাওহীদের সারকথা হল

- আল্লাহ ছাড়া প্রভু হিসেবে কাউকে না চাওয়া

-আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক হিসেবে কাউকে গ্রহণ না করা

-আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিধানদাতা না মানা

আল্লাহ তাঁর রাসূলের বিধানে আত্মসমর্পণ ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। সত্যিকারের ঈমান তখনই পূর্ণতা পায় যখন তার সঙ্গে সৎকর্মযুক্ত হয়। এই জন্য ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাসনতন্ত্রসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানের রঙে রাঙানো দরকার।

2. ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা - শাসনব্যবস্থায় বৈষম্য, অন্যায় ও জুলুম দূর করা।

ইসলাম এমন একটি সরকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যা ন্যায়বিচার সমতা ও বাধ্যতামূলক পরামর্শের ভিত্তিতে গঠিত। জনগণের অধিকার আছে যে তারা তাদের সরকার বেছে নিবে। যেখানে রাষ্ট্র বাইয়াত, পরামর্শ, উপদেশ অন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এটি এমন একটি সংবিধান যা আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সরকার নিজে প্রণয়ন করেনি এবং পরিবর্তন করার ক্ষমতাও সরকারের নেই বরং এর সংবিধান আল্লাহর শরীয়া।

আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

> “যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই জালিম।”

— (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪৫)

এর দ্বারা বোঝা যায়, রাষ্ট্রের আইন ও প্রশাসন ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হওয়াই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি।

শুধু আইনি বিধান- হুদুদ, কিসাসের বাহ্যিক প্রয়োগেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়; যদিও তা শরীয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ বরং ইসলামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো, প্রকৃত ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠা করা, যা মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে শুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহতালা তাদের পরিশুদ্ধ করে দিবেন।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনকে ইসলামী শরিয়া শাসন করবে, ইসলামী বোধ নেতৃত্ব দেবে, ইসলামী আচার পরিশীলিত করবে এবং ইসলামী শিষ্টাচার সুশোভিত করবে।

ইসলামী সমাজ হবে পারস্পারিক সহযোগিতা পূর্ণ একটি সমাজ। যেখানে কেউ অনাহারে থাকবে আর তার পড়শী তৃষ্ণার ঢেকুর তুলবে - এমনটা হবে না।

3. মানবকল্যাণ সাধন – জনগণের মৌলিক অধিকার (জীবন, সম্পদ, মর্যাদা, ধর্ম) নিশ্চিত করা।

ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। মানুষকে তার যথাযথ মর্যাদা প্রদান করে। ইসলাম রাষ্ট্র ও তার নাগরিক উভয়ের স্বাধীনতায় রক্ষা করে। তবে তা হতে হবে চিন্তার স্বাধীনতা কুফরি নয়। মননের স্বাধীনতা, প্রবৃত্তির নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অপপ্রচারের নয় এবং অধিকারের স্বাধীনতা, পাপাচারের স্বাধীনতা নয়।

ইসলাম সম্পদ সংরক্ষণ করে এবং একে জীবনের মূল উপাদান ও ব্যক্তির মূল অবলম্বন হিসেবে দেখে। কেননা সম্পদ ছাড়া পৃথিবীর উন্নতি ও ধর্মের সহায়তা করা সম্ভব নয়। ইসলাম সম্পদের অপচয় বিলাসিতা গাফিলতির বিরুদ্ধে সতর্ক করে। ইসলাম এতিমের সম্পদ রক্ষা করে। একই সাথে জাতীয় সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর জোর দেয়।

ইসলাম অমুসলিমদের নিরাপত্তা দান ও মৌলিক অধিকার রক্ষায়ও বিশেষভাবে জোর দেয়। এটি গণতন্ত্র থেকে জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা ও কৈফিয়ৎ গ্রহণ করে। একইভাবে সমাজতন্ত্র থেকে মজলুম ও শোষিতদের অধিকার আদায়ের সর্বোত্তম উপায়গুলো গ্রহণ করে।

এছাড়াও ইসলাম নারীকে সম্মানিত করে এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি বিশেষ যত্নশীল। ইসলাম মানুষের জন্য বৈধ বিনোদনের সুস্থ আনন্দের সুযোগ করে দেয় কারণ ইসলাম ব্যক্তির শারীরিক মানসিক ও বুদ্ধি ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা যত্নশীল।

ইসলাম শিক্ষা দীক্ষা ও নৈতিক দিক নির্দেশনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এমনকি আইন কানুনের চেয়েও বেশি। কারণ, আইন কানুন সমাজ গঠন করতে পারে না। বরং, অবিরাম শিক্ষা সচেতনতা ও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা সমাজ গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

মক্কায় নবুওয়তের প্রথম যুগে ইসলাম ছিল কেবল দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির আন্দোলন;

কিন্তু মদিনায় হিজরতের পর নবী ﷺ একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন —

যেখানে ছিল সংবিধান (মদিনা সনদ), বিচার ব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি।

এটাই ইসলামের “ধর্ম-রাষ্ট্র ঐক্য”-এর বাস্তব মডেল।

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়।

ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও চূড়ান্ত বিধান অনুযায়ী ইসলামী ব্যবস্থাপনায় একাধিক দল থাকা বৈধ। রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নতা ফিকহী মাযহাবের বৈচিত্রের মতো। ইসলামী দল ও আন্দোলনের বৈচিত্র একই রকম। এই বৈচিত্র হতে হবে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে, হিংসা বিদ্বেষের ভিত্তিতে নয় তারা শাখাগত মতবিরোধ ভুলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এক কাতারে এসে দাঁড়াবে। তাদের সকলের কেন্দ্রবিন্দু হবে কুরআন ও সুন্নাহ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে আকিদা, শরিয়া ও নৈতিকভাবে ইসলামকে বিজয় করা।

পশ্চিমা সভ্যতার “সেকুলারিজম” ধারণা বলে — ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না। কিন্তু ইসলাম বলে —

“ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দীন।” (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৩)

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না, বরং রাষ্ট্রের নীতিমালা, আইন, ন্যায়বিচার—সবই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে অনেক রাষ্ট্র “সেকুলার” নামে ধর্মকে প্রশাসন থেকে আলাদা করে ফেলেছে।

ফলে, ইসলামী মূল্যবোধ আইন, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে স্থান হারাচ্ছে।

ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করে রাখলে ইসলামের পূর্ণতা বিকৃত হয় এবং সমাজে জুলুম, বৈষম্য ও নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ে।

অধ্যায় ৩: সেকুলারিজম

৩:১ সেকুলারিজমের ধারণা ও সংজ্ঞা :

“সেকুলারিজম” শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ “saeculum” থেকে, যার অর্থ “এই জগত” বা “ধর্মীয় নয় এমন বিষয়”। আরবি অভিধানেও এই শব্দটি ধর্মের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। সেকুলারিজম শব্দের সাধারণ ও সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য অর্থ হল রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করা। এবং তাকে ব্যক্তির অন্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা।

অনেকেই সেকুলারিজম বলতে বোঝায় ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু পৃথিবীর কোনো অভিধানে সেকুলারিজম অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা লেখা নেই। এটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। কারণ প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম যদিও রাষ্ট্র থেকে আসমানী ধর্মকে পৃথক করে, ব্যক্তিগত বিষয় বলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে আত্মপূজারী আরেকটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। আরো স্পষ্ট করে বললে সেকুলারিজম নিজেই একটি ধর্ম। এই ধর্মের শরীয়ত কিংবা সাংবিধানিক মাপকাঠি হলো হিউমেনিজম। এই ধর্মের প্রভু হল মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো আকল। সেকুলারিজম নিজেই একটি ধর্মীয় অথোরিটি সংরক্ষণ করে। সে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সকল ধর্মীয় অনুশাসনকে সে নিজস্ব মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। সে যদিও মুখে বলে যে সব ধর্ম তার স্বাধীনতা পাবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেকুলারিজম একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত হালাল গ্রহণ করতে এবং হারাম বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার নিজস্ব হালাল-হারাম এর ধারণা রয়েছে। তার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোন বিষয় সে বেআইনি বা বাতিল করে দিতে পারে। মোটকথা একটি ধর্মের ফুল কনসেপ্ট সেকুলারিজমে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে সেকুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং সে নিজেই একটি ধর্ম।

তাছাড়া পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা বলতে কিছু হয় না। হয় কোনো কিছুর পক্ষে নয়তো বিপক্ষে। প্রত্যেকেই যেকোনো একটা মাপকাঠির অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। যে নিজেকে কোন কিছু থেকে নিরপেক্ষ দাবি করে সে বর্তমানে পরিস্থিতি অনুযায়ী যার পক্ষে আছে পরিস্থিতি বদলালে সে তার বিপক্ষেও চলে যেতে পারে। সুতরাং নিরপেক্ষ বলতে কিছু হয় না, এটা একটা ফাঁদ মাত্র।

ইসলামে যেমন কোন নিরপেক্ষতা নেই তেমন সেকুলারিজমেও কোন নিরপেক্ষতা নেই। হয়তো ইসলাম নয়তো কুফর।

জামালউদ্দিন আফগানী তাঁর রদে আলাদদাহিরিয়া (জড়বাদীদের খণ্ডন) গ্রন্থে বলেছেন, Secularism এর অসংখ্য অর্থ প্রকাশিত হয়।

প্রথমত, Secularism অর্থ হলো Scepticism বা সংশয়বাদ। সংশয়বাদ সেই মতবাদকে বলা হয় যা জ্ঞান, সত্য ও সত্ত্বা-এই তিনটি বিষয়েরই কোনো স্থায়ী, নিশ্চিত ও সার্বজনীন রূপ বা অস্তিত্ব স্বীকার করেনা। সংশয়বাদীরা সর্বদাই নিজস্ব মতবাদ ও বিশ্বাসকে যেমন সন্দেহ করে, তেমনিভাবে অন্যের মতামত, আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতিও কোনো আস্থা তারা পোষণ করতে পারেনা। অন্যদিকে, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্ত্বা বা অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণে দেখা যায়না, তার অস্তিত্বকেও তারা স্বীকার করেনা। ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকিদা সম্পর্কে তাদের

কোন সংশ্লিষ্টতা থাকেনা। আর ধর্মীয় বিশ্বাস যেহেতু নেই সেহেতু, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতিরও কোনো গুরুত্ব উক্ত সংশয়বাদীদের নিকট থাকেনা। সাধারণ আটপৌরে সামাজিক ও রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলসহ জীবনের চলার পথের সর্বত্রই যেমন ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে চলে বা ধর্মীয় বিধান পালন করে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে, সংশয়বাদ অর্থের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সে ধরনের কোনো জীবন যাপনে অভ্যস্ত নয়। ফলস্বরূপ, এ জাতীয় মানুষ কিছুটা সমাজ ও রাষ্ট্রবিমুখ হয়ে থাকে।

Secularism-এর অন্য একটি অর্থ হলো নাস্তিক্যবাদ or Atheism। এ অর্থে ব্যক্তি কোন ধর্ম, ঈশ্বর বা আধ্যাত্মসত্তা ও পরকালকে স্বীকার করেনা। এ ক্ষেত্রে Secularism জড়বাদ, বস্তুবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মতবাদের সমার্থক যা যাবতীয় অজড় ও অশরীরী সত্তাকে অবিশ্বাস করে।

Secularism-এর অন্য একটি অর্থ হলো চরম অভিজ্ঞতাবাদ (Extreme Empiricism) ও যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (Logical Positivism)। এ মতবাদগুলোর মধ্যে David Hume-এর অভিজ্ঞতাবাদটি বেশী চরমবাদ। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের বাইরে কোনো বস্তু বা সত্তাকে এ মতবাদ স্বীকার করেনা। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরাও প্রত্যক্ষণের অতীত কোনো কিছুর অস্তিত্বকে অর্থহীন মনে করে। অধিবিদ্যার জগত এবং সে জগতের সত্তা ও অস্তিত্বকে এরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করেনা। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় যা পরখ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই।

Secularism-এর অন্য একটি অর্থ হলো Agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ।" এ মতে Secularism অর্থ হলো ঈশ্বর বা সত্তা আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, তাদের মতে মানুষের সাধারণ চলার পথে এগুলি ছাড়াও চলা যায়।

সেকুলারিজমের সবচেয়ে সঠিক অনুবাদ হচ্ছে ধর্মহীনতা কিংবা পার্থিবতা। এটি কেবল পরকালের বিপরীতার্থক নয় বরং সুনির্দিষ্ট অর্থে ধর্ম থেকে সম্পর্কহীনতা কিংবা ধর্মের বিপরীতে থাকা বোঝায়।

প্রাচ্যবিদ আরবেরি তার 'রিলিজিয়ন ইন দ্যা মিডল ইস্ট' গ্রন্থে সেকুলারিজম সম্পর্কে বলেন: "বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, মানবতাবাদ, প্রকৃতিবাদ, দৃষ্টবাদ- সবই ধর্মহীনতার রূপ। ধর্মহীনতা ইউরোপ ও আমেরিকার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।"

আন্তর্জাতিক তৃতীয় নতুন অভিধানে সেকুলারিজম শব্দের ব্যাখ্যা:

জীবন বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে এটা এমন একটা প্রবণতা, যা এই নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে যে, ধর্ম সরকার-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না। এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ এটি সরকার ব্যবস্থায় পুরোপুরি ধর্মহীন রাজনীতি বুঝায়।

অর্থাৎ, সংজ্ঞাগতভাবে সেকুলারিজম হলো রাষ্ট্র সব ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে। রাষ্ট্র নিজে কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে না। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সংবিধান মোতাবেক চলবে আর ব্যক্তি তার মতো করে ধর্ম পালন করবে। এর কাজে ধর্মের কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না।

তবে যারা বলে সেকুলারিজমের মানে হল সকল ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ হওয়া। তারা মূলত ভুল দাবি করে। সেকুলারিজম সব ধর্ম ও মতবাদের প্রতি নিরপেক্ষ থাকে না। কারণ সেকুলারিজমের নিজস্ব আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামো আছে। আছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে আলাদা ধারণা। সেকুলারিজম তার নিজস্ব মাপকাঠি অনুযায়ী বিচার করে যেই সমস্ত বিষয়কে তার সাথে সাংঘর্ষিক পায় সেগুলোকেই দমন করে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে তো নয়ই, ব্যক্তিগত পর্যায়েও সেকুলারিজম অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকে না। এজন্য দেখা যায় হিজাব, বিয়ে, দাড়ির মতো ব্যক্তিগত ইসলামী বিধানগুলোও সেকুলার রাষ্ট্রে নানাভাবে আইনি জটিলতার শিকার হচ্ছে।

৩:২ ঐতিহাসিক পটভূমি:

সেকুলারিজম এমন এক মতবাদ যা ধর্ম ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি আলাদা রাখার পক্ষে দাঁড়ায়।

তবে এর পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস ও বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে—

বিশেষত ইউরোপীয় সমাজের ধর্মীয় নির্যাতন, চার্চের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং রেনেসাঁ-পরবর্তী বুদ্ধিবাদের উত্থান।

একসময় খ্রিস্টানরা ছিল ইহুদীদের চরম শত্রু। খ্রিস্টানরা তখন ইহুদীদের উপর সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও লাঞ্ছনাকর কর্মকাণ্ড চালাত। কিন্তু এক পর্যায়ে ইহুদীরা তৎকালীন বিজ্ঞানের রাজধানী ইউরোপের মুসলিম শাসনাধীন স্পেনকে খ্রিস্টানদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করল। তারা কর্ডোভা ও গ্রানাডা ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত উপকরণ ইউরোপে ছড়িয়ে দিল এবং সেই সাথে বিজ্ঞান শিক্ষায় মিশিয়ে দিল ধর্মহীনতার বিষয়। ফলে একপর্যায়ে পুরো ইউরোপের আপাত ধার্মিক চরিত্র ও ধর্মীয় নৈতিকতা গায়েব হয়ে গেল। এরপর রেনেসাঁ, এনলাইটেনমেন্ট এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট রিফর্মেশন আন্দোলনের মাধ্যমে পোপ ও গির্জার ক্ষমতায়ন কে নিঃশেষ করে দিয়ে খ্রিষ্টান সমাজের উপর নিজেদের

প্রভাব প্রতিষ্ঠার পথ উন্মোচন করল। এভাবেই পশ্চিমা সভ্যতার মাধ্যমে সেকুলারিজমের উৎপত্তি হয়।

□ প্রাচীন যুগে ধর্ম ও রাজনীতি

প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে — যেমন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোম — ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা ছিল না।

রাজারা নিজেদেরকে “ঈশ্বরের প্রতিনিধি” বা “দেবতা” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেন।

অতএব, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা একীভূত ছিল।

কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভবের পর ইউরোপে এক ভিন্ন প্রবণতা দেখা যায়।

প্রাথমিকভাবে খ্রিষ্টান সমাজে “সিজারকে সিজারের, ঈশ্বরকে ঈশ্বরের” (Give unto Caesar what is Caesar’s) ধারণা প্রচলিত হয় —

যার মাধ্যমে ধর্ম ও রাজনীতিকে আংশিকভাবে পৃথক করার বীজ বপন হয়।

□ মধ্যযুগে চার্চের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

খ্রিষ্টান ইউরোপের মধ্যযুগ (৫ম-১৫শ শতাব্দী) ছিল “চার্চের কর্তৃত্বের যুগ”।

চার্চ কেবল ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেরও নিয়ন্ত্রণ করত।

বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা — সব কিছুই চার্চের অনুমতির বাইরে ছিল না।

কিন্তু এর ফল হয়েছিল ভয়াবহ:

বিজ্ঞানীদের নিপীড়ন (যেমন গ্যালিলিও, ব্রুনো প্রমুখ),

চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দমন,

এবং সমাজে জ্ঞানের স্থবিরতা।

এই দমননীতি থেকেই বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের মধ্যে চার্চবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়,

যা পরবর্তীতে সেকুলার চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করে।

□ রেনেসাঁ ও রিফরমেশন আন্দোলন

রেনেসাঁ (Renaissance) মানে “পুনর্জাগরণ” — ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর ইউরোপে জ্ঞানের ও মানববাদের জাগরণ ঘটে।

১৪৫৩ সাল থেকে সাধারণত রেনেসাঁর সূচনা ধরা হয় মাঝখানে এক দীর্ঘ সময় ছিল খ্রিস্টান ধর্মের অধীনে। তাদের মতে, যেহেতু গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইউরোপের মেধায় পচন ধরেছিল, এবং ১৫০০ শতাব্দীতে এসে সেই মেধা আবার সচল ও সজীব হয়ে উঠেছিল; তাই এই যুগকে তারা রেনেসাঁর যুগ বলে। ১৫শ শতাব্দীতে এসে আবার গ্রিক সভ্যতা প্রাধান্য পেতে থাকলো ধর্মের উপর। মানুষের মন মস্তিষ্ক থেকে ধর্মীয় চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হতে লাগলো। এক নতুন রূপে মানববাদের চর্চা শুরু হলো। যা মূলত ছিল মধ্যযুগে খ্রিস্ট ধর্মকে ত্যাগ করার নামান্তর। মানুষ কথিত ব্যক্তিসত্তাবোধ চিনতে লাগলো এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার জোয়ার শুরু হলো।

এরপর আসে রিফর্মেশন (Reformation) — চার্চ সংস্কারের আন্দোলন, যা মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে শুরু হয় (১৬শ শতাব্দী)।

লুথার চার্চের দুর্নীতি ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেন যে, “মানুষ সরাসরি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।”

এ আন্দোলন ইউরোপকে ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত করলেও, রাজনৈতিকভাবে চার্চের ক্ষমতা ভেঙে দেয়।

রিফর্মেশন এর নামে যে আন্দোলন দানা বেধেছিল, ১৭শ এবং ১৮শ শতকে এসে তা উপহার দিল পুরোপুরি ধর্মহীনতার চিত্র। তখন মানুষ ঘোষণা করে: “মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি।”

এই সময় ধর্ম নয়, বরং যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানব বুদ্ধি হয়ে ওঠে সমাজের চালিকাশক্তি।

□ আলোকায়ন যুগ (Enlightenment)

১৭শ থেকে ১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপে শুরু হয় “Enlightenment” বা আলোকায়ন যুগ।

এই সময়ের চিন্তাবিদরা (যেমন — ভলতেয়ার, রুশো, লক, মন্টেস্কু প্রমুখ) বলেছিলেন:

রাষ্ট্র পরিচালনা ধর্মীয় কর্তৃত্ব নয়, মানব যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হতে হবে।

-লক (John Locke) প্রথম “Church and State separation” ধারণা দেন,

-রুশো “Social Contract” এর মাধ্যমে ধর্মহীন নাগরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন।

এই চিন্তাগুলোই পরবর্তীতে সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করে।

☐ ফরাসি বিপ্লব ও সেক্যুলার রাষ্ট্রের সূচনা

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ছিল সেক্যুলারিজমের বাস্তব রূপ। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং একই সাথে দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চ ধর্মীয় কর্তৃত্ব ত্যাগ করে মানুষকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। এর স্লোগান ছিল স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব (Liberty- equality- fraternity)। এই বিপ্লবে “চার্চ ও রাজতন্ত্র”-এর জোট ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রকে ঘোষণা করা হয় “ধর্মনিরপেক্ষ” (Laïque)। এরপর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেক্যুলার নীতি গৃহীত হয়।

☐ আধুনিক সময়ের বিস্তার

১৯শ শতাব্দীর পর থেকে সেক্যুলারিজম ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে — বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোতে। উপনিবেশিত মুসলিম দেশগুলোতেও পশ্চিমা মডেলের এই “ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা” ঢুকে পড়ে, যেখানে ইসলামকে ব্যক্তিগত ইবাদত বা নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়।

বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম:

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যেখানে জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তবুও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শে “সেক্যুলারিজম” বা “ধর্মনিরপেক্ষতা” একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিভাষা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এই ধারণার উৎপত্তি এসেছে মূলত ঔপনিবেশিক শাসন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে।

স্বাধীন বাংলাদেশে (১৯৭১-বর্তমান) সেক্যুলারিজমের রাষ্ট্রীয় যাত্রা:

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদকে মুক্তির পথ হিসেবে দেখেছিলেন এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

(ক) স্বাধীনতার পর প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে (১৯৭২) চারটি মূলনীতি গৃহীত হয়:

1. জাতীয়তাবাদ
2. সমাজতন্ত্র
3. গণতন্ত্র
4. ধর্মনিরপেক্ষতা (সেকুলারিজম)

এখানে “সেকুলারিজম” মানে বলা হয়েছিল —

রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেবে না, এবং ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে।

(খ) ১৯৭৫-১৯৮৮: ইসলামী মূল্যবোধের পুনঃউত্থান

১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রের কাঠামোতে ইসলামী মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ফিরে আসে। পরবর্তীতে, ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিটি সরিয়ে দেন এবং এর পরিবর্তে “পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর” এই কথাটি প্রতিস্থাপন করেন। এরপর ১৯৮৮ সালে সংবিধানের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্মের মধ্যে একটি সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি করে। এবং এই সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে মর্যাদা দেওয়া হলেও, প্রশাসনিক কাঠামো পশ্চিমা সেকুলার ধারায় থেকে যায়।

(গ) ২০১১ সালের সংবিধান সংশোধন

২০১১ সালে ১৫তম সংশোধনের মাধ্যমে “সেকুলারিজম” আবার পুনর্বহাল করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও বহাল রাখা হয়। ফলে এখন বাংলাদেশে একটি দ্বৈত কাঠামো দেখা যায় —

একদিকে সংবিধানে সেকুলারিজম, অন্যদিকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম।

৩:৩ সেকুলারিজমের প্রকারভেদ:

সেকুলারিজমের প্রকারভেদকে প্রধানত রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক সেকুলারিজম, যা রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করে এবং সকল

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। এছাড়া, দার্শনিক সেকুলারিজম আছে, যেখানে ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে, এটি নাস্তিকতা এবং ধর্মবিমুখতাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

আমরা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নাস্তিকতা ও পরোক্ষ নাস্তিকতা দু'ভাগে ভাগ করেছি, কারণ সাধারণ লোকেরা নাস্তিকতা বলতে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করাকেই বুঝায়, অথচ সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাও এক প্রকার নাস্তিকতা, বরং নাস্তিকতার একটি শাখা হচ্ছে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

সরাসরি নাস্তিকতা:

এ প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) দ্বীনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তা ধর্মীয় কোনো বিষয় স্বীকার করে না, বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ জাতীয় সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারীরা নিজেদের কুফরি, অশ্লীলতা ও কুকর্মে আত্মগর্বী ও অহংকারী। তাদের কুফরির ফয়সালা করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ। আলহামদুলিল্লাহ তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। কোনো মুসলিম তাদের দিকে ধাবিত হয় না, তবে যে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় সে ব্যতীত। এ ধরনের সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) জনসাধারণের নিকট কম বিপজ্জনক, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম নয়।

পরোক্ষ নাস্তিকতা:

এ প্রকার নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার উপর ঈমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের শ্লোগান দুনিয়াকে দ্বীন থেকে পৃথক কর। জনসাধারণকে ধোঁকায় ফেলা ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) অপেক্ষাকৃত বেশি বিপজ্জনক। কারণ তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের নিকট প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে।[2] দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলম না থাকার কারণে তারা সেকুলারিজমকে (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে) কুফরি বলে মনে করে না। এ কারণে মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার সেকুলার (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদের অনুসারী। অনেক, বরং অধিকাংশ মুসলিম তাদের হাকিকত জানে না।

এছাড়া আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকারভেদ হলো -

ক. কঠোর/উগ্র সেক্যুলারিজম (Assertive/Hard/Radical Secularism)

বৈশিষ্ট্য: ধর্মকে জনপরিসরের জন্য হুমকি মনে করা এবং এই ধারণায় ধর্মকে পুরোপুরি রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে।

ধর্ম রাষ্ট্রীয় নীতিতে কোনো ভূমিকা রাখে না।

রাষ্ট্র আইন, নৈতিকতা ও শিক্ষায় ধর্মীয় প্রভাব নিষিদ্ধ করে।

ধর্মীয় চিহ্ন, প্রতীক বা শিক্ষা সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থান পায় না।

উদাহরণ:

ফ্রান্সের “Laïcité” বা কড়া ধর্মনিরপেক্ষতা।

ফ্রান্সে স্কুলে হিজাব, ক্রস বা ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

খ. নমনীয়/উদার সেক্যুলারিজম (Passive/Soft/Moderate Secularism)

এই রূপে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা হলেও রাষ্ট্র ধর্মের বিরোধী নয়।

রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু ধর্মীয় আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গ্রহণ করে না।

বৈশিষ্ট্য:

ধর্ম পালন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে যায় না।

রাষ্ট্রীয় নীতিমালা “জনস্বার্থ” ও “মানবাধিকার” ভিত্তিক।

রাষ্ট্র কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত দেখায় না।

উদাহরণ: আমেরিকান মডেল, যেখানে রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে সমর্থন না করলেও ব্যক্তি তার ধর্মীয় অভিব্যক্তি জনপরিসরে প্রকাশ করতে পারে।

৩:৪ সেক্যুলারিজমের মূলনীতি:

১.রাষ্ট্র থেকে ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ (Separation of State and Religion):

- রাষ্ট্রের কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম থাকবে না।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা অর্থায়নে হস্তক্ষেপ করবে না।

এই নীতিটি সেক্যুলারিজমের সবচেয়ে পরিচিত বৈশিষ্ট্য। এর মূল কথা হলো, রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একে অপরের কার্যক্রমে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না।

রাষ্ট্রীয় সংস্থা (যেমন: সরকার, আইনসভা, আদালত) এবং ধর্মীয় সংস্থা (যেমন: চার্চ, মসজিদ, মন্দির কর্তৃপক্ষ) সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কাজ করবে। এদের সাংগঠনিক ও আইনি কাঠামো পৃথক থাকবে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। একইভাবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২. ধর্মীয় নিরপেক্ষতা (State neutrality):

•রাষ্ট্র সকল ধর্মের প্রতি সমানভাবে নিরপেক্ষ থাকবে (অথবা কোনো ধর্মের প্রতিই পক্ষপাতি হবে না)।

•নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

রাষ্ট্র তার সকল নাগরিককে, তারা যে ধর্মীয় বা অ-ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারী হোক না কেন, আইনের দৃষ্টিতে সমান চোখে দেখবে এবং তাদের প্রতি সমান আচরণ করবে।

রাষ্ট্র কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা না করাই নয়, বরং সকল ধর্মের নাগরিকদের তাদের বিশ্বাস ও চর্চা (আইনের সীমার মধ্যে) করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। এই স্বাধীনতা নাস্তিকতা বা ধর্মহীনতার অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

রাষ্ট্র যখন কোনো আইন বা নীতি তৈরি করে, তখন সেই আইন বা নীতি যেন কোনোভাবেই বিশেষ কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সুবিধা বা অসুবিধা না দেয়। আইনগুলো অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ বা সর্বজনীন যুক্তির ভিত্তিতে তৈরি হতে হবে।

৩. জনপরিসরে ধর্মের অনুপস্থিতি (Privatization of Religion):

এই নীতিটি সেক্যুলারিজমের একটি মৌলিক দাবি যে ধর্ম কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটিকে ইংরেজিতে 'Privatization' (ব্যক্তিগতকরণ) বলা হয়।

ধর্মকে পাবলিক স্ফিয়ার (রাজনীতি, আইন, শিক্ষা, অর্থনীতি) থেকে প্রাইভেট স্ফিয়ার (ব্যক্তিগত বাড়ি, উপাসনা স্থান) -এ সীমাবদ্ধ রাখা।

•পাবলিক স্ফিয়ার (Public Sphere/জনপরিসর):

রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন, অর্থনীতি, শিক্ষা, মিডিয়া এবং সাধারণ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্র।
সেকুলারিজম চায় এই ক্ষেত্রটি ধর্মমুক্ত (religion-free) হোক।

•প্রাইভেট স্ফিয়ার (Private Sphere/ব্যক্তিগত পরিসর):

এটি ব্যক্তির বাড়ি, উপাসনালয় (মসজিদ/মন্দির/গির্জা) এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চার ক্ষেত্র।

এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্র ও সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে ধর্মীয় প্রভাবকে কার্যকরভাবে অপসারণ করা। এর কৌশলগুলো নিম্নরূপ:

সরকারি অফিস, আদালত, বিদ্যালয় বা অন্যান্য জনপরিসর থেকে ধর্মীয় প্রতীক (যেমন: হিজাব, ক্রস, ফেজ টুপি ইত্যাদি) বা ধর্মীয় অভিব্যক্তি (যেমন: কর্মক্ষেত্রে প্রার্থনা) বর্জন করা।
সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে ধর্মীয় গ্রন্থ বা ঐশী বিধানের পরিবর্তে মানবীয় যুক্তি, মানবাধিকার এবং সর্বজনীন চুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা।

ধর্মীয় নেতাদের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার সমালোচনামূলক ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনা এবং তাদের কার্যক্রমকে কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা।

8. আইনের সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of Human Law):

সেকুলারিজমের অধীনে আইনের সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় যে, কোনো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনি কর্তৃত্ব কেবল মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সংবিধান ও মানবীয় আইনের হাতে থাকবে, কোনো ঐশী বা ধর্মীয় আইনের হাতে নয়।

সেকুলার রাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে আইন, বিচার ও শাসনের ভিত্তি হবে মানুষের যুক্তি (Reason), অভিজ্ঞতা (Experience) এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (Democratic Process)।

এটি শরীয়াহ (ইসলামী আইন) বা অন্য কোনো ধর্মীয় আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন বা সংবিধানের উৎস হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মীয় আইন কেবল ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে (যেমন: বিবাহ, তালাক—যদি রাষ্ট্র অনুমতি দেয়) প্রযোজ্য হতে পারে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (সংসদ) বা সংবিধানই হলো আইনের চূড়ান্ত উৎস। সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জনগণের প্রয়োজন মেটাতে এই আইন পরিবর্তনযোগ্য।

এই নীতির ফলে সেক্যুলার রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আইন প্রণেতারা কোনো ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে বা ধর্মীয় নীতিমালার প্রতি বাধ্য না থেকে আইন তৈরি করতে পারে (যেমন: সুদের বৈধতা, সমলিঙ্গের বিবাহ, বা গর্ভপাতের আইন)।
বিচার বিভাগ ঐশী আইনের পরিবর্তে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও মানবীয় আইনের ভিত্তিতে রায় প্রদান করে।

অধ্যায় ৪: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখা : এক বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ

৪:১ ইসলাম বনাম সেক্যুলারিজম:

সেক্যুলারিজম ও ইসলাম — উভয়ই মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি (worldview) প্রদান করে,

কিন্তু তাদের মৌলিক ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইসলাম শুরু হয় “আল্লাহ”-কে কেন্দ্র করে,

আর সেক্যুলারিজম শুরু হয় “মানুষ”-কে কেন্দ্র করে।

এই দুটি ভিত্তি থেকে সমাজ, রাজনীতি, নৈতিকতা ও জ্ঞানের ধারণা দুই বিপরীত পথে এগোয়।

কারণ সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি হয়েছে যেই কারণে ইসলাম সেই কারণ এর মধ্যেই পড়ে না। সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি হয়েছে মূলত খ্রিস্টান সমাজের নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। সেখানে ইসলামের মধ্যে এরকম নির্যাতনের কোন ইতিহাস নেই বরং ইসলাম সর্বদা ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম এসেছেই জাহিলিয়াদের অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর মধ্যে আনার জন্য। পৃথিবীতে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

ইসলাম মানবধর্ম। জাতি-ধর্ম বংশ-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সৌজন্যমূলক আচরণ, জীবের প্রতি দয়া এই ধর্মের অন্যতম শিক্ষা।

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

‘হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।’ (সূরা নিসা-৫৮)

সুতরাং সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ,ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আলাদা করে সেকুলারিজম এর প্রয়োজন নেই।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দীন। আকিদা, ইবাদত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষাসহ মানব জীবনের সবকিছু এই ধর্মের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। ইসলাম ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়।

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চিরকালের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।’ (সূরা মায়িদা-৩)

ইসলাম মানব জীবনের আত্মিক ও বস্তুগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ সেকুলারিজম এই সর্বজনীনতাকে মেনে নেয় না এবং জীবনকে রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় দুটি ক্ষেত্রে ভাগ করে। যা ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

খ্রিস্ট ধর্ম মানব জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারে। এক অংশ ধর্মের জন্য এবং অন্য অংশ রাষ্ট্রের জন্য। ইঞ্জিলের ভাষায় এক অংশ ঈশ্বরের অপর অংশ কায়সারের। সুতরাং যা কায়সারের তা কায়সারকে দাও যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।

কিন্তু ইসলাম জীবনকে অবিভাজ্য একক হিসেবে দেখে এবং মানুষকে অখন্ড সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলাম মনে করে আল্লাহই সমগ্র জীবনের পরিচালক, সমস্ত মানুষের প্রতিপালক, তাই আল্লাহর সাথে কায়সারের অংশীদারিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আকাশ ও পৃথিবীর সকল সত্তা ,এমনকি কায়সার ও কায়সারের অধীন সবকিছুই আল্লাহর। তাই জীবনের কোন অংশকে আল্লাহর নির্দেশনা থেকে দূরে রেখে, ব্যক্তি পরিচালনা করতে পারে না। ইসলাম পুরো জীবনকে তার বিধান ও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করতে চায়।

ইসলাম চায় মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি জন্মের আগের এবং মৃত্যুর পরের সময়কালেও তার নির্দেশনা ও বিধান মেনে চলুক। ইসলাম জীবনের মূল অংশবাদ দিয়ে শুধু প্রান্তিক বংশে অবস্থান করতে চায় না। ইসলাম নেতৃত্ব চায় কোন নেতৃত্বের অধীন হতে চায় না। অথচ সেকুলারিজম চায় ইসলাম তার অধীন হোক তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলুক।

সেকুলারিজম ইসলামকে কেবল তখনই আনন্দচিত্তে স্বাগত জানায় যখন ইসলাম সীমাবদ্ধ থাকে মিলাদ অনুষ্ঠানে, শোকসভায়, পীরদের খানকায় এবং মিথ্যা কাহিনী রূপকথার জগতে ।

কিন্তু ইসলাম যখন সক্রিয় হয় এবং অন্যদের সক্রিয় করে, তরুণদের পথ দেখায়, জনতার নেতৃত্ব দেয়, মানুষের মাঝে ন্যায্যতার মানদণ্ড স্থাপন করে, মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকতে, ভালো কাজের আদেশ দিতে, মন্দ কাজে প্রতিবাদ করতে, বিশৃঙ্খলা বিব্রান্তি প্রতিহত করতে শেখায়, তখন সেকুলারিজম তা কোনভাবেই মেনে নেয় না। তখনই সেকুলাররা বলে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা রাখতে হবে।

তারা চাইলে ইসলাম জীবনের নির্দিষ্ট একটা দিক দেখুক এবং একটা কোণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। ইসলাম অনুযায়ী শুধু নামাজ রোজাই হোক,, মু'য়ালামা - মু'য়াশারা, হুদুদ কিসাসের মত বিষয়গুলো গণতন্ত্রের মতানুসারে হোক।

কিন্তু ইসলাম স্বভাবতই সীমাবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ইসলাম জীবনের একটি অংশ নয় বরং এটি পুরো জীবনের পথপ্রদর্শক ও নির্মাতা। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ ২০৮

“হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর”।

সূরা বাকারা: ২০৮

প্রথম নজরে মনে হতে পারে ইসলাম ও সেকুলারিজমের এই সংঘাত শুধুমাত্র শরিয়্যা নিয়ে। কিন্তু এই সংঘাত মূলত ইসলামের প্রধান চারটি মৌলিক শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান:

১. আকিদা ও সেকুলারিজম:

সেকুলারিজম ইসলামের আকিদাগত দিককে অস্বীকার করে না। মানুষকে আল্লাহ রাসুল ও পরকালে বিশ্বাস করতে মানা করেনা। কিন্তু তাওহীদ যা ইসলামের মূল ভিত্তি -এটি কেবল মুখে বলা একটি শব্দ নয়। বরং এটি মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিক নৈতিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি একজন মুসলিমের উপর আবশ্যিক করে দেয় যে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে মানবে না, আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য প্রার্থী হবে না, এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিধানদাতা হিসেবে মানবে না। কিন্তু সেকুলারিজম সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে বিধানদাতা হিসেবে

মানেনা তারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে সমর্থন করে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যুতে তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মানতে নারাজ।সেকুলাররা বলে ধর্ম আল্লাহর, রাষ্ট্র সবার।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই সেকুলারিজম তাত্ত্বিক বা মৌখিকভাবে ইসলামের আকিদা গ্রহণ করলেও ,এই আকিদা থেকে উদ্ভূত দায়িত্ব এবং তার অনুসারীদের উপর বাধ্যতামূলক কর্তব্য গুলি প্রত্যাখ্যান করে।

যেমন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মেনে নেওয়া এবং কোনরকম দ্বিধা সংকোচ ছাড়া তাদের কাছে পরিপূর্ণ সমর্পিত হওয়া। এটাই ঈমানের দাবি এবং ইসলামের চুক্তিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়ার শর্ত।

কুরআন সুস্পষ্টভাবে এটাই বলেছে:

আল্লাহ তার রাসূল কোনো বিষয় নিতে দিলে, কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

সূরা আহযাব: ৩৬

কিন্তু সেকুলারিজম চায় আকিদা কেবল ব্যক্তির অন্তরে লুকায়িত থাকুক।জীবন পরিচালনায় তার ভূমিকা না থাকুক। তার ধারণা, যদি তা প্রকাশের অনুমতি পায় ও তবে তা মসজিদের চার দেয়ালের ভেতরের সীমাবদ্ধ থাকবে।

২. সেকুলারিজম এবং ইবাদত:

সেকুলারিজম ইসলামকে একটি ইবাদত হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে না। কারণ এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার অংশ। তবে এই ইবাদতকে জীবনের লক্ষ্য কিংবা মানুষের প্রধান কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে না।

যেমন সেকুলারিজম কাউকে নামাজ পড়তে বাধা দেয় না, কিন্তু কেউ প্রতিনিয়ত নামাজ ত্যাগ করলে তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপও নেয় না। এটা যে একটা গুরুতর অপরাধ ,কাফের হওয়ার কারণ ,এটা সেকুলারিজম মেনে নেয় না। তাদের মতে কেউ কাউকে সালাত আদায়ে বাধ্য করতে পারবে না।তেমনি সেকুলারিজম যাকাতকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং এটাকে ব্যক্তিগত ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। যা কেউ

ইচ্ছাকৃতভাবে পালন করতে পারে তবুও তাকে ট্যাক্স পুরোপুরি আদায় করতে হবে। এবং কেউ চাইলে উপেক্ষা করতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই বা অভিযোগ নেই।

৩. সেকুলারিজম ও নৈতিকতা:

আপাত দৃষ্টিতে ইসলাম ও সেকুলারিজমের মধ্যে নৈতিকতা নিয়ে কোন বিরোধ নেই মনে হতে পারে কারণ নৈতিকতাই জাতির ভিত্তি উন্নতি স্তম্ভ এটা সেকুলারিজমও বিশ্বাস করে। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে:

•যেমন নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ইসলাম পশ্চিমা নীতি অবলম্বন করে না কিন্তু সেকুলাররা তার অন্ধভাবে অনুসরণ করে। ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত যেকোনো ধরনের যৌন সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, একে ব্যভিচার বা বিকৃত আচরণ হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু সেকুলারিজম এটাকে উৎসাহিত করে এবং নারী পুরুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হিসেবে দাবি করে।

অপরদিকে ইসলাম কঠোরভাবে যেই সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়, যা ফিতনার বাতাস বয়ে আনে -যেমন অশ্লীল গান, উত্তেজক ছবি উন্মুক্ত কাহিনী এবং প্ররোচনামূলক পোশাক। সেকুলারিজম এসব বিষয়কে কোন সমস্যা মনে করে না বরং ফিতনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

তারা শালীন পোশাককে সমর্থন না করে, অশালীন পোশাক পরিধান করার জন্য বিভিন্ন অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে, যেমন তারা বলে "আমার দেহ আমার পছন্দ" "মনের পর্দাই বড় পর্দা, যার অন্তর পবিত্র তার কাছে পোশাক কোন ব্যাপার না" ইত্যাদি।

৪. সেকুলারিজম এবং শরিয়া:

সেকুলারিজম ইসলামের যেই দিকটির বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থায় গ্রহণ করে তাহলে শরিয়া। অর্থাৎ ইসলামের আইনগত বা বিধানগত দিক। কতক সেকুলার হয়তো এ বিষয়ে কিছুটা নমনীয়তা দেখায়। তারা পরিবার সংক্রান্ত ইসলামী আইন বা তথাকথিত ব্যক্তিগত আইন সমূহ যেমন ; বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ইসলামের অধীনে রাখতে সম্মত হয়। তারা মনে করে এসব বিষয় মানুষের ধর্মীয় কিংবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু মূল ধারার সেকুলারিজম ইসলামের জন্য কোন আইনগত অবস্থান রাখে না। এমনকি ব্যক্তিগত আইনেও না। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের স্থান কেবল মানুষের অন্তরাত্মা বা মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যেমনটা আমরা দেখতে পেয়েছি তুরস্কের আতাতুর্কের সেকুলারিজমে। সেখানে ইসলামী আইনের সকল ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত আইন থেকেও। এই কারণে তারা তালাক নিষিদ্ধ করেছে, একাধিক বিবাহের অনুমতি বাতিল করেছে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমতা সাধন করেছে, ইসলামিক শরিয়া এবং ধর্মের অপরিহার্য বিধানের সরাসরি লঙ্ঘন।

এছাড়াও সেকুলারিজমে সুদ ঘুষ নিষিদ্ধ নয়, ব্যাভিচার ও মদ্যপান নিষিদ্ধ নয়, অপরাধের জন্য দণ্ড নির্ধারণে যে শারীরিক শাস্তি দেওয়া, যেমন: চাবুক মারা হাত কেটে ফেলা এগুলো তারা মানে না। অর্থাৎ তাদের অনুকূলে নয় এমন সকল বিধানই তারা অস্বীকার করে।

অর্থাৎ তারা হয়তো আল্লাহকে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে অস্বীকার করে না তবে তার শাসন ও বিধান দেওয়ার অধিকার অস্বীকার করে। অথচ ইসলাম এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি শাসক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় ইসলামের মূলনীতি এবং সেকুলারিজম এর মূলনীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর ইসলামের মূলনীতিগুলো কেউ ত্যাগ করলে তাকে ধর্মনিরপেক্ষ নয় বরং তাকে ধর্মহীনই বলা যায়।

সেকুলারিজম ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করতে চায়। এর অর্থ হল ধর্মীয় নির্দেশনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা। ব্যক্তিগত বলতে কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, 'আমি'র মাঝে সীমাবদ্ধ। 'আমি' এর বাইরে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান কিংবা জীবনসঙ্গী অদি গেলেই তা পাবলিক লাইফ হয়ে যায়। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন ধর্মকে এটি পারিবারিক জীবনও নয় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা এক 'আমি'র মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। বাস্তবতা হলো, সেকুলারিজম ব্যক্তি জীবনকেও প্রভাবিত করে। কারণ, সেকুলারিজমের মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়। এর মূল উপাদান হলো আল্লাহ এবং দ্বীনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা।

ধর্মীয় প্রভাব অস্বীকারের ব্যাপারটি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই হতে পারে। যেমন তথাকথিত মুসলিমদের অনেকেই নিজেদের প্রফেশনাল লাইফ কে দ্বীনের প্রভাব থেকে মুক্ত মনে করে। ফলে দেখা যায় কোন কাজকে সত্তাগতভাবে হারাম মনে করলেও পেশা হিসেবে বৈধ মনে করছে।

এটা মুসলিম জীবনের সেকুলারিজমেরই প্রভাব। অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটার সহ অনেক হারাম পেশায় নিয়োজিত মুসলিম ব্যক্তিজীবনে নামাজ -রোজা পালন করছে ;কিন্তু পেশা হিসেবে সুস্পষ্ট হারাম কাজগুলোকে বৈধ মনে করছে। এই অস্বীকৃতি একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও হতে পারে। ব্যক্তি জীবন থেকে যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের ধারণা হারিয়ে যায়, ধর্মের প্রভাবত প্রত্যাগত হয় তবে তা সেকুলারিজমেরই অংশ।

এইভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। নয়তো কেউ মুসলিম থাকবে না।

৪:২ মুসলিম সমাজের সেকুলার প্রভাবের অনুপ্রবেশ:

মুসলিম সমাজে সেকুলারিজমের প্রবেশ ইতিহাসগতভাবে একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। ইসলাম নিজস্ব স্বরূপে একটি সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ায় মুসলমানদের ঐতিহাসিক মানসে ধর্ম-রাষ্ট্র বিচ্ছেদের কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যগত পতন, উপনিবেশবাদ, আধুনিকতার উত্থান, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মিলিতভাবে মুসলিম সমাজে এমন একটি চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে—যেখানে ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা এবং রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করার প্রবণতা ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে।

এই অধ্যায়ে সেকুলার প্রভাবের এই অনুপ্রবেশকে কয়েকটি মৌলিক উপাদানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

ক. উপনিবেশবাদ: মুসলিম সমাজে সেকুলার কাঠামো আরোপের সূচনা

উপনিবেশবাদ ছিল মুসলিম সমাজে সেকুলারিজম প্রবেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ইসলামী সাম্রাজ্যগুলো দুর্বল হয়ে পড়লে ইউরোপীয় শক্তিগুলো মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরোপ করে নতুন প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা—যার ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচিন্তা। যার প্রভাবে ,

ইসলামি বিচারব্যবস্থাকে খণ্ডিত করে শরীয়াকে কেবল “ব্যক্তিগত আইন”—এ সীমাবদ্ধ করা হয়।

প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং ফৌজদারি আইন ইউরোপীয় কোড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

কাজি আদালতকে দুর্বল করে ব্রিটিশ সিভিল কোর্ট চালু করা হয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ফলে মুসলিম সমাজে প্রথমবারের মতো ধর্ম রাষ্ট্রের বাইরে একটি “ব্যক্তিগত রীতি” হিসেবে চিত্রিত হতে শুরু করে—যা সেক্যুলারিজমের মূল ধারণা।

খ. পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব

মুসলিম সমাজে সেক্যুলারিজমের সবচেয়ে গভীর অনুপ্রবেশ হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। বিশেষ করে উপনিবেশ-পরবর্তী সময় থেকে মুসলিম দেশগুলোর স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির পাঠ্যক্রমে ইসলামের বিশ্বদৃষ্টিকে বাদ দিয়ে ইউরোপীয় দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতি ও আইনকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্ট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় রেনেসাঁর দৌরাতে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যখন পরাজয় ঘটে। তখন প্রটেস্ট্যান্ট ও রিফর্মিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে খ্রিস্ট ধর্ম গির্জায় প্রবেশ করে। একদা যে যাজকতন্ত্র ও পোপতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নিয়ন্ত্রণকারী ও শোষণকারী শক্তি তথা মহা শক্তিদ্বারা চার্চ হিসেবে বিবেচিত হতো, তা সবকিছু পরিত্যাগ করে গীর্জামুখী হতে থাকে। প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতিতে জড়বাদী দর্শনের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। অতি অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম সমাজের সর্বত্রই ইউরোপীয় নাস্তিক্যবাদী দর্শনের পঠন-পাঠন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ইংরেজী শিক্ষার আদলে ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ, হার্বার্ট স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্কস-এর দ্বন্দ্বিক জড়বাদ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ, এমিল ডুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, জন লক, রুশো ও হবস-এর ব্যক্তিস্বাভাববাদ প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রাচ্যের তথা মুসলিম জাহানের সর্বত্রই ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব তথা তুরস্ক, মিশর, মধ্য-এশিয়া, পারস্য, পাক-ভারত উপমহাদেশ প্রভৃতি স্থানের সনাতনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একদিকে যেমন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা যথা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাসাউফ, মানতিক, ফালসাফা, আরবী ব্যাকরণ

প্রভৃতির পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল; তেমনিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিরও ব্যাপক প্রভাব ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

ফলে দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়—

ধর্মীয় শিক্ষা(মাদ্রাসা) ও সেকুলার/পাশ্চাত্য শিক্ষা (স্কুল -কলেজ)।

পরবর্তীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিকাশের ফলে মুসলিম সন্তান কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আরবী ব্যাকরণ এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য না শিখে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকুলার শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়গুলোতে ইসলামকে শুধুমাত্র ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা নামক একটি বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ফেলা হয়। যেখানে দ্বীন শিক্ষার চেয়ে কিছা কাহিনীই বেশি। ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসেবেই চিনে।

অপরদিকে সরকারি মাদ্রাসা গুলোতেও দ্বীন শিক্ষার বেহাল দশা, সেগুলো নামে মাত্রই মাদ্রাসা। চলছে পুরোপুরি পাশ্চাত্য সিলেবাসে। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের চিন্তাজগতে গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়।

এই ফাটলের ফলে মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণির একাংশ ইসলামের রাষ্ট্রীয় ভূমিকা নিয়ে সংশয়ী হয়ে ওঠে।

গ. বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সেকুলার মতাদর্শের সংক্রমণ

১৮-২০ শতকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা ইউরোপীয় আধুনিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সামাজিক-রাষ্ট্রিক দৃষ্টিকোণকে পাশ্চাত্য কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা শুরু করেন। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো:

স্যার সাঈদ আহমদ খান মুসলিম সমাজকে পশ্চিমা শিক্ষার দিকে পরিচালিত করেন। তার সংস্কারগুলো হলো মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা প্রসারের উপর জোর দেওয়া, ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা, মুসলিমদের নিজস্ব জাতীয় চেতনা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করা, এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আগে আধুনিক জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা। তিনি আলীগড় আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং পশ্চিমা ধাঁচের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ঘটান।

যদিও তিনি নাকি ভারতবর্ষের মুসলিমদেরকে হিন্দুদের গোলামী থেকে বের করার জন্য কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করেছেন তবে এর ফলাফল হয়েছে উল্টো। ধীরে ধীরে এই শিক্ষার প্রভাবে তথাকথিত মুসলিমরা এখন ব্রিটিশদেরই গোলামী করে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই মডেল হিসেবে দেখে।

অপরদিকে কামাল আতাতুর্ক আরো এক ধাপ এগিয়ে তুরস্কে সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন—খিলাফত বাতিল করেন, শরীয়াকে প্রতিস্থাপন ও ইউরোপীয় আইন প্রয়োগ করেন। এমনকি সেকুলার মুসলিমগণ ন্যূনতম বিবাহ - তালাক, উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ বন্টনের জন্য ইসলামী বিধান মানতেন সেগুলোও তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। ধর্মকে পুরোপুরি ব্যক্তিগত করে দিয়েছেন তুরস্কে।

এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতার ফলে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশ ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার পক্ষে দৃঢ় হতে থাকে।

ঘ. মিডিয়া, সংস্কৃতি ও জীবনধারায় সেকুলার মূল্যবোধের প্রভাব

গণমাধ্যম, সাহিত্য, সিনেমা ও বিনোদনমূলক সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে সেকুলারিজমকে জনপ্রিয় রূপে ছড়িয়ে দেয়। এর প্রভাবে পরিবার, লজ্জা-হায়া, সামাজিক দায়বদ্ধতা—এসব ইসলামী মূল্যবোধ কম দৃশ্যমান হতে থাকে।

পশ্চিমা পোশাক, উৎসব, সম্পর্ক এবং জীবনধারা “আধুনিকতার প্রতীক” হিসেবে প্রচারিত হয়।

এই সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ কখনো সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে যায় না, বরং ধর্মকে ধীরে ধীরে ব্যক্তি ও সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

মিডিয়ায় সেকুলার মূল্যবোধের প্রভাব:

মিডিয়া (টিভি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়া) মানুষের চিন্তা-চেতনা গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। সেকুলার মূল্যবোধ মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণত এভাবে ছড়ায়—

মিডিয়ার মাধ্যমে এক দেশে বসেই আরেক দেশের ভিন্ন সংস্কৃতি দেখে প্রভাবিত হচ্ছে মানুষ। মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অনৈতিক ছবি ভিডিও সহজেই ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা বিশ্বে। বিধর্মীদের ড্রামা, নাটক, সিনেমার মাধ্যমে সহজেই অপসংস্কৃতি প্রবেশ করছে মুসলিম সমাজে। হারাম সম্পর্ক, বিয়ে ছাড়াই একসাথে সংসার করা, ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতা কিংবা শরীরী প্রদর্শনকে “ব্যক্তিগত স্বাধীনতা”র নামে স্বাভাবিক করা হচ্ছে মুসলিম সমাজে। অনেকেই বাস্তবে এসবকে সমর্থন না করলেও মিডিয়াতে এসবকে সাধারণভাবেই গ্রহণ করে।

সংস্কৃতিতে সেকুলার মূল্যবোধের প্রভাব:

সংস্কৃতি মানুষের জীবনযাত্রা, পোশাক, রুচি, উৎসব, ভাষা— সবকিছুতে প্রভাব ফেলে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় চিহ্ন কমে যাচ্ছে, বদলে “universal human culture” ধারণা জোরালো হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু করে আবার তারপরেই সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গায়। এটা ইসলামে হারাম, কিন্তু এটা নিয়ে কেউ কথা বলে না। কারণ তারা ভাবে ধর্ম ব্যক্তিগত আর প্রতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠান আলাদা জিনিস। সামাজিকতা রক্ষা করতে এমন অনেক কিছুই করা লাগে। এই যে অপসামাজিকতা এটা মূলত সেকুলার মূল্যবোধের প্রভাবেই তৈরি হয়েছে।

কেউ ব্যক্তিগতভাবে গান শুনেনা, নামাজ রোজা আদায় করে, হজ করে এসেছে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানগুলোতে গান-বাজনার মধ্যে উপস্থিত থাকে। সামাজিকতা রক্ষা করতে। এই যে ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখে অপসামাজিকতাকে রক্ষা করা এটাই সংস্কৃতিতে সেকুলারিজমের প্রভাব।

পশ্চিমা রীতির অনুকরণে মুসলিম সমাজের বিয়ে গুলো সহজ থেকে কঠিন হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিধর্মী রীতিনীতি অনুসরণে বিয়েকে করা হয়েছে কঠিন এবং ব্যয়বহুল। অথচ মুসলিম সমাজে বিয়ে হতো সুন্নতি নিয়মে। খুবই সহজ এবং অনারম্বর ভাবে।

পহেলা বৈশাখ ও বিভিন্ন পূজা উৎসবে মুসলমানদের অবাধ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দাড়ি টুপি পরা, হিজাব বোরকা পরা অনেকেই সেখানে যায়। তারা বলে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু উৎসব রাষ্ট্রের সকলের। অথচ এ সমস্ত উৎসব

ইসলামে হারাম । এই পরিবর্তন একদিনে হয়নি ধীরে ধীরে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এর মাধ্যমে এই বিস্তারিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আধুনিক জীবনধারায় সেকুলার মূল্যবোধ

জীবনধারা— যেমন পোশাক, বিনোদন, সম্পর্ক, খাদ্যাভ্যাস— এসবেও সেকুলার প্রভাব স্পষ্ট। হায়া/মর্যাদাকে “ব্যক্তিগত পছন্দ” বানিয়ে ফেলা হয়েছে। পশ্চিমাদের অনুকরণে সৌন্দর্য প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেয়েদেরকে বস্ত্রহীন করা হচ্ছে। স্লোগান দিচ্ছে" দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়"

মেয়েরাও হায়া ,লজ্জা ত্যাগ করে এই অনুষ্ঠানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আগে বিদ্যালয় গুলোতে, যানবাহনে ছেলে মেয়ে পাশাপাশি বসত না। এখন এখন নিঃসংকোচে আলাদা আসন থাকার পরেও ছেলে মেয়ে পাশাপাশি বসছে।।এভাবে লজ্জা ,ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে সহজেই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এসব তো সেকুলারিজমেরই প্রভাব।

যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হচ্ছে । বয়স্ক বাবা- মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখা, বাচ্চাদেরকে ডে কেয়ারে রাখা ,এগুলো সেকুলার লাইফস্টাইল চিন্তার অংশ।

৪.৩ সেকুলারিজমের ইসলামীকরণ: মুসলিম সমাজে এক নীরব রূপান্তর

সেকুলারিজমের ইসলামীকরণ বলতে বোঝায়—

সেকুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) ধারণাকে ইসলামের ভাষা, পরিভাষা ও চেহারা দিয়ে মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল।

আধুনিক মুসলিম সমাজে সেকুলার প্রভাব অনুপ্রবেশের অন্যতম সূক্ষ্ম কৌশল হলো সেকুলারিজমের ইসলামীকরণ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো—সরাসরি ইসলামকে অস্বীকার না করে; বরং ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও বিশ্বদৃষ্টিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা, যাতে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে সেকুলার মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করে। এর ফলে ইসলাম থাকে নাম ও আচারের মধ্যে, কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, অর্থনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রীয় দিকগুলো চলে যায় সেকুলার ধারার নিয়ন্ত্রণে।

এই প্রক্রিয়া সাধারণত এমনভাবে পরিচালিত হয় যে সাধারণ মুসলিম বুঝতেই পারেন না ইসলামের জায়গায় কীভাবে একটি বিকল্প দর্শন জায়গা করে নিচ্ছে।

সেকুলারিজম কে যারা ধর্মীয় পোশাক পড়াতে চায়, তারা তাদের এই জঘন্য কর্মের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে মদিনা সনদকে। মদিনা সনদকে সামনে রেখে তারা মানুষকে দেখাতে চায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেকুলার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ)

এটি নিতান্তই একটি ভুল ধারণা। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সালাফদের কেউ মদিনা সনদকে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সাব্যস্ত করেননি। মদিনা সনদ কেবল একটি প্রতিরক্ষামূলক অঙ্গীকারনামা। অঙ্গীকারনামা কখনোই মৌলিক ভিত্তি হতে পারে না। কারণ অঙ্গীকারনামা একটি সাময়িক ও আপাত পরিস্থিতি কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়। তাছাড়া যখন মদিনা সনদ করা হয়, ইসলামী শরীয়ত তখনো অপূর্ণাঙ্গ ছিল। এমনকি তখন জিজিয়ার বিধানও ছিল না। আর মদিনা সনদের ধারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে কেউ সেখানে কোনভাবেই সেকুলার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাবে না।

অনেকে তো সেকুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটা ইসলামী দেখাতে চায়, উদাহরণ হিসেবে তারা এরদোগানের তুরস্ককে উপস্থাপন করে। অথচ সেখানেও সেকুলারিজমেরই চর্চা হয়। সেটাকে ইসলাম সমর্থন করে না।

সেকুলারিজমের ইসলামীকরণে প্রথম ধাপ হচ্ছে ইসলামের পরিভাষা ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে সেকুলার আদর্শকে বৈধতা দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়—

“ইসলামী গণতন্ত্র”, “নৈতিক ইসলামী রাষ্ট্র”, “আধুনিক মুসলিম সমাজ”, “সহনশীল ইসলাম” ইত্যাদি টার্ম।

বাহ্যিক অর্থে এগুলো ইতিবাচক মনে হলেও, ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় যে এগুলো এমন এক ইসলামকে তৈরি করে যা কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতে সীমাবদ্ধ, আর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত সিদ্ধান্তগুলো সেকুলার নীতিতে পরিচালিত।

এভাবে ইসলামের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেও বলা হয়— “এটাই প্রকৃত ইসলাম”।

সেকুলারিজমের ইসলামীকরণের আরেকটি কেন্দ্রীয় কৌশল হলো শরীয়াহকে আইনি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নৈতিকতার পর্যায়ে নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে ইসলামের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয় তাহলে তাওহীদুল হাকিমিয়াত। তাওহীদুল হাকিমিয়াত হলো রাষ্ট্রে ফয়সালা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর শরীয়া হওয়া। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা রায় প্রদানের চর্চা থাকা। সুতরাং ব্যভিচারের অনুমোদন না দেওয়া, সুদ নিষিদ্ধ করা, জিমিদের থেকে ট্যাক্স নেওয়া, শুধু বাস্তবায়ন করা - এসব হাকিমিয়াতেরই অংশ। মুসলিমদের ব্যাপারে যে আদেশ-নিষেধ রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের যে নির্দেশনা রয়েছে তা প্রয়োগ করাও হাকিমিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদুল হাকিমিয়াতকে উপেক্ষা করে সেকুলারিজম কে অনুসরণ করেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, তুরস্কসহ অনেক মুসলিম দেশ। এসব দেশে শরীয়াহ আদালত নামমাত্র থাকলেও পারিবারিক আইন, বিবাহ-তালাক, উত্তরাধিকার — এই তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া শরীয়াহ কোথাও কার্যকর নয়। অর্থনীতি, শিক্ষা, রাজনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি সেকুলার আইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এভাবে মুসলিম সমাজে একটা ধারণা তৈরি করা হয়—

“ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনের জন্য, সমাজের জন্য নয়।”

অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী, একাডেমিক, আধুনিক আলেম এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব “মডারেট ইসলাম” বা “সফট ইসলাম” ধারণা প্রচার করেন। এটি দেখলে ইসলামী বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সেকুলার মূল্যবোধের সঙ্গে সমন্বিত একটি দ্বন্দ্বহীন রূপ। এ ধারায় বলা হয়—

ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনা করতে নয় ইসলাম নৈতিকতা, মানবতা ও সহনশীলতা শেখায়, ইসলামকে আধুনিক মূল্যবোধের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

একই রকম আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে মডারেট মুসলিম অর্থাৎ আধুনিকতাবাদী মুসলিম। এরা আদি ও আসল ইসলামকে বর্তমান সময়ের জন্য অকার্যকর ও সেকেলে মনে করে। তাই ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায়, ইসলামের পরিমার্জিত সংস্করণ বের করতে চায়। এরা মূলত ইসলামকেও পরিত্যাগ করতে চায় না আবার নিজেদের প্রবৃত্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই এরা নিজেদেরকে পরিবর্তন না করে বরং ইসলামকেই পরিবর্তন করে নিজেদের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চায়। পর ইসলামকে পাশ্চাত্যের ধারা জীবন ব্যবস্থা এবং তার সভ্যতার সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা, যাতে করে ইসলামের ইতিবাচক

দিকগুলো পালন করা যায়, আবার প্রবৃত্তি পূজার অংশ হিসেবে নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে অংশগ্রহণ করা যায়। বর্তমানের শহরাঞ্চল এবং উচ্চপদস্থ মুসলিমদের বেশিরভাগই নিজেদেরকে মডারেট মুসলিম হিসেবে দাবি করে। এরা আদতে মুসলিমই নয় বরং এরা সেকুলার।

এদের কারণেই ধীরে ধীরে ইসলামিক কাঠামো সেকুলার কাঠামোতে পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন আগে শরিয়া বিচার কায়ম ছিল। চুরি, জিনা, ব্যভিচারের জন্য হুদুদ প্রদান করা হতো। কতক দয়াশীল মানবতাবাদীরা এর বিপক্ষে অবস্থান করে। তাই অনেক মুসলিম দেশেও এখন হুদুদ নিষিদ্ধ। যার কারণে এসব অপরাধ এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে।

আগে সুদ ছিল হারাম। কর্জে হাসানাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এখন কর্জে হাসানাহ বিলুপ্ত হয়েছে এবং সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা হয়ে গেছে অর্থনীতির মূল কাঠামো।

এভাবে পরিভাষার চোরাবালিতে সেকুলারিজমের ইসলামীকরণ করে মুসলিম সমাজে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

8.8 সেকুলারিস্ট মুসলিম

বর্তমান মুসলিম সমাজে তথাকথিত “সেকুলারিস্ট মুসলিম” নামে পরিচিত একটি শ্রেণি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, এরা মূলত মুসলিমই নয়। কারণ এদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—ইসলামকে একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে নয় বরং কেবল ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ একটি ধর্মীয় পরিচয় হিসেবে উপস্থাপন করা। এ শ্রেণির মানুষ ব্যক্তিগত স্তরে নামাজ, রোজা বা ঈদ উদযাপনের মাধ্যমে ধর্মীয় আনুগত্য প্রকাশ করলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত এবং রাজনৈতিক পরিসরে ইসলামের নির্দেশনাকে অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকে। এরা চায় রাজনীতি অর্থনীতি বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে ধর্মের বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। রলস - এর ভাষায় এরাই হলো লিবারেলিস্ট।

তারা প্রায়ই পশ্চিমা সেকুলার মূল্যবোধকে “সর্বজনীন” ও “প্রগতিশীল” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে এবং ইসলামী আইন ও নৈতিকতার বিচার করার ক্ষেত্রে সেটিকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে হিজাব, লিঙ্গবোধ, পরিবারব্যবস্থা, অর্থনীতি, উত্তরাধিকার বা দণ্ডবিধির মতো ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনাকে “সাংস্কৃতিক রীতি”, “ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট” বা “সমসাময়িক বাস্তবতায় অপ্রাসঙ্গিক”—এই ধরনের ভাষ্যে দুর্বল করে উপস্থাপন করা হয়।

এই মনোভাবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা অস্বীকার করা। সেকুলারিস্ট মুসলিমরা সাধারণত ইসলামকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং রাজনৈতিক, আইনগত বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামী শরিয়াহর কোনো অবস্থান থাকা উচিত নয় বলে দাবি করে। এর ফলে মুসলিম পরিচয়ের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক গর্ব বা আধুনিক মানবাধিকার-ভিত্তিক পরিচয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। সমান্তরালে ইসলামী সমাজে পশ্চিমা বিনোদন ও সংস্কৃতির অনুকরণ, পারিবারিক মূল্যবোধে উদারপন্থা, হালাল-হারামের প্রতি উদাসীনতা এবং ধর্মীয় অনুভূতিকে বিদ্রূপ বা ক্ষুদ্রায়িত করার চর্চাও সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে এই প্রবণতা এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ তৈরি করে যেখানে ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পেছনে পড়ে যায় এবং মুসলিম সমাজের চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে সেকুলার বিশ্বদৃষ্টির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই শ্রেণীর মুসলিমরা ইসলামের বিশুদ্ধ ও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ, কিংবা সে অবস্থানকে জেনেও প্রত্যাখ্যান করছে নানা অজুহাতে। অপরদিকে তারা পাশ্চাত্য জাহিলিয়াত সম্পর্কেও একেবারেই বেখবর। এজন্যই তারা সেকুলারদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের অজান্তেই ঈমানহারা হয়ে বসে আছে। তারা নিজেদেরকে নিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম ভাবছে অথচ তারা যে আর মুসলিমই নয় সেটা তারা বুঝতেও পারেনা।

তাহাড়া পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা বলতে কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকেই যেকোনো একটা মাপকাঠির অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। দুনিয়ায় এমন কোন অবস্থা নেই যা নিরপেক্ষ হতে পারে। যেমনটা সেকুলারিস্ট মুসলিমরা বলে, "আমি অমুক বিষয়ে মুসলিম না হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে চিন্তা করব"। এমন মন্তব্য চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্বুদ্ধিতা। ইসলামের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সে তো কুফরি অবস্থান গ্রহণ করেছে। সেটা আবার নিরপেক্ষ হয় কিভাবে? ইসলামের বাহিরে যাওয়ার অর্থই হলো কুফরি গ্রহণ করা।

বর্তমান মুসলিম সমাজের সেকুলারিজমের প্রভাব এতটাই প্রকট হয়েছে যে, মুসলিমরা ব্যক্তিগত জীবনেও সেকুলার মতাদর্শ অনুসরণ করেছে এবং ইসলামী শরিয়াকে পরিত্যাগ করেছে। তার কিছু বাস্তবসম্মত উদাহরণ পেশ করা হলো:

১) বিবাহের ক্ষেত্রে:

বিবাহের মতো গুরুতর একটি ইবাদতকে অনেকেই “কেবল সামাজিক অনুষ্ঠান” মনে করে বিভিন্ন অনৈতিক ও অসংগত আয়োজন যুক্ত করেন—যেমন ডিজে ডান্স, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশোভন পোশাক, দেনমোহরের অবমূল্যায়ন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই নিকাহ পড়ানোর আগে ছেলে-মেয়ের সম্মতি „মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি ইসলামী কাঠামো অনুযায়ী নিশ্চিত করা হয় না; বরং সিভিল ম্যারেজ বা রেজিস্ট্রেশনের সহকেই বিবাহের প্রকৃত স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে অহরহ নাজায়েজ বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছে।

২) তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে সেকুলারাইজড অনুশীলন:

বর্তমান সমাজে দেখা যায়, অনেক সেকুলারমনা মুসলিম বিবাহকে কেবল একটি নাগরিক চুক্তি হিসেবে দেখেন; ফলে ইসলামী বিধানকে পাশ কাটিয়ে কোর্টের একতরফা সই বা আবেদনকে তালাক হিসেবে গণ্য করেন। যেমন—স্ত্রী কেবল কোর্টে একটি ফরমে সই করলেই “তালাক হয়ে গেছে”—এ ধরনের ধারণা প্রচার পায়; অথচ ইসলামে স্ত্রী তালাক দেয় না, বরং খুলা বা ফাসখ—নির্দিষ্ট রীতি ও শর্তযুক্ত প্রক্রিয়া রয়েছে। ইসলামী শরিয়াহর স্বীকৃত প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে কোর্টের সিদ্ধান্তকে ‘ধর্মের চেয়ে উন্নত কর্তৃত্ব’ হিসেবে মানা—সেকুলার চিন্তারই প্রতিফলন। ফলে সমাজে এমন তালাক দেখা যায় যা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অকার্যকর।

৩) ইদতের বিধান ও সেকুলার ব্যতিক্রমী আচরণ:

ইসলামে ইদত নারীকে আর্থিক নিরাপত্তা, পরিবারিক স্থিরতা এবং সন্তান-নিশ্চয়তার জন্য নির্ধারিত সময়; কিন্তু সেকুলার প্রভাবিত সমাজে এটিকে “অযৌক্তিক সময় নষ্ট”, “নারীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে” বলে উপস্থাপন করা হয়। তালাকের পর বা স্বামীর মৃত্যুর পর ইদত না মেনে অবিলম্বে সামাজিক মেলামেশা, কর্মস্থলে অতিমাত্রায় যুক্ত থাকা, অন্য সম্পর্ক শুরু করা বা নতুন বিয়ে করার ঘটনা ঘনঘন দেখা যায়—যা শরিয়াহর সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী এবং সরাসরি সেকুলার আইনের প্রভাব।

৪) সম্পত্তি বণ্টন: ইসলামী উত্তরাধিকার আইনকে অতিক্রম করে সেকুলার সমতা:

ইসলামী উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অধিকার নিশ্চিত হলেও তার অংশ ও পুরুষের অংশ—দায়িত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত। কিন্তু সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয়, “এটা জেন্ডার বৈষম্য”,

“ছেলে-মেয়ে সমান ভাগ পাবে”—ফলে ধর্মীয় নিয়ম বাতিল করে সিভিল ল' অনুযায়ী সমান ভাগ করে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অনেক পরিবারে সন্তানরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয় বা কোর্টের মাধ্যমে সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে—যা ইসলামে বাতিল এবং মৃত ব্যক্তির জন্য গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদি তার রেখে যাওয়া সম্পদ শরিয়াহ অনুযায়ী না বণ্টিত হয়।

৫) পরিবারব্যবস্থায় সেকুলার নৈতিকতা প্রাধান্য পাওয়া

ইসলামী পরিবার ধারণায় স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও ভূমিকা পরস্পর পরিপূরক; কিন্তু সেকুলার চিন্তা এগুলোকে “লিঙ্গ বৈষম্য” মনে করে। ফলে—

স্বামীর কাফেলা (পরিচর্যা ও খরচের দায়িত্ব) বাতিল করে “উই আর ইকুয়াল পার্টনার” বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা যায় স্বামী ঘর সামলায় আর স্ত্রী উপার্জনে বাহিরে যায়, সন্তান লালন-পালন ও অভিভাবকত্বে ইসলামী নিয়ম উপেক্ষা করা হয়—এগুলোও সেকুলার মূল্যবোধের সরাসরি অনুকরণ।

৬) পোশাক-পর্দায় সেকুলার প্রভাব

ইসলামের পর্দার বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও সেকুলার মুসলিমরা এটিকে ব্যক্তিগত পছন্দ, যুগোপযোগিতা বা “সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য” হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তারা বলে—

“হিজাব বাধ্যতামূলক নয়, শুধু শালীন থাকলেই চলবে”,

“এটা ধর্মীয় নয়, আরব কালচারের পোশাক”,

“আমার দেহ, আমার পছন্দ”

“সকলের পোশাকের স্বাধীনতা রয়েছে”।

এমন বক্তব্য এবং নীতি সমাজে হিজাব, নিকাব, জিলবাবকে দুর্বল করে দেয় এবং অশালীন পোশাককে “স্বাধীনতা” হিসেবে প্রচার করে। এর ফলেই দেখা যায়, অনেক মুসলিম পরিবার ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশেও পাশ্চাত্য অনুকরণে অশোভন ও টাইট পোশাককে স্বাভাবিক করে নিচ্ছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সেকুলাররা সকলকে পোশাকের স্বাধীনতা দিলেও কোন মুসলিম যদি বোরকা হিজাব পরে কিংবা দাড়ি টুপি রাখে তবে তখন তারা সেটিকে মেনে নেয় না এবং জঙ্গি বলে ব্যঙ্গ করে। স্কুল-কলেজে, চাকরিতে কিংবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রকৃত মুসলিমদেরকে প্রায়শই পর্দা রক্ষা করা এবং পোশাক নিয়ে অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

৪.৫ সেকুলার বনাম ধার্মিক

বর্তমান মুসলিম সমাজে “সেকুলার” ও “ধার্মিক”—এই দুটি মানসিকতা ইসলামের ভূমিকা ও পরিধি নিয়ে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। অথচ কেউ কেউ অনেক সময় সেকুলারিজমের বৈধতা প্রমাণ করতে এমন ব্যক্তির উদাহরণ দেন যিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুবই ধর্মপ্রাণ, নামাজ পড়েন, কপালে সিজদার চিহ্ন রয়েছে, মাঝেমাঝে ইমামতিও করেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন “রাজনীতিতে ধর্ম নেই ধর্মে রাজনীতি নেই।”

এটা খুবই অযৌক্তিক একটি উদাহরণ। কারণ যেকোনো মুসলিম, যার ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান রয়েছে, সে জানে বিশেষ কোন ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ড তাদের কাজের বৈধতার প্রমাণ নয়।

এছাড়াও কেউ যদি বলে একজন ব্যক্তি সেকুলার হলেও সে ধর্মপ্রাণ, তাহলে এটাও পরস্পর বিরোধী কথা। কিভাবে তাকে ধর্মপ্রাণ বলা যেতে পারে যে কিনা আল্লাহর আইন এবং রাসূলের শাসন প্রত্যাখ্যান করে?

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আল্লাহ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।

সূরা আহযাব: ৩৬

যদি কোন নেতা নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, হজ করেন এবং ওমরা করেন, তদুপরি সেকুলারিজমকে শাসনের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে এর মানে হতে পারে যে তিনি দ্বৈত ব্যক্তিত্বের স্বীকার যা অনেক মুসলিমের মধ্যে দেখা যায়। তাদের জীবন হয়ে ওঠে অসঙ্গত এবং পরস্পর বিরোধী। তারা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করেন এবং

আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করেন। তবে তাদের ঘরোয়া জীবন বা পারিবারিক সম্পর্ক ইসলামী আদর্শ পরিচালিত হয় না।

ফলে তাদের স্ত্রী বা কন্যা প্রকাশ্যে খোলামেলা পোশাকে বের হয় তারা নাচে না আসলে যোগ দেয়, অথবা তিনি নিজে এসব করেন কিংবা মদ পানের টেবিলে বসে থাকেন যদিও তিনি মদ পান না করেন। এগুলো সব ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় এটা কিভাবে নামাজ এবং রোজার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়? তখন তার উত্তর হতে পারে এটি এক জিনিস আর সেটি আরেক জিনিস।

এই ধরনের উদাহরণগুলি মূলত অজ্ঞ বা বোকা বানানোর ফল। ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণেই মুসলিম সমাজের সেকুলার এর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিজীবনে যতই ধর্মপ্রাণ হোক না কেনো সে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ না করলে কখনোই সে মুসলিম থাকে না। বরং সে সেকুলারই।

অধ্যায় ৫: ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধারের পথ

সমসাময়িক মুসলিম সমাজে সেকুলার প্রভাব, চিন্তা ও কাঠামোর অনুপ্রবেশ ইসলামকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ করে ফেলায় একটি গভীর পরিচয় সংকট তৈরি হয়েছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধার—যেখানে দীন ও দুনিয়া, আধ্যাত্মিকতা ও রাষ্ট্রনীতি, ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়—সবই একক আল্লাহকেন্দ্রিক বিশ্বদৃষ্টির অধীনে পরিচালিত হবে।

বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধারের পথকে সুগম করা যায়। যেমন:

ক. দীন ও দুনিয়ার একীকরণ: নববী আদর্শ

নবী ﷺ-এর মিশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দীন ও দুনিয়ার একতা। ইসলামের চোখে ইবাদত শুধু সালাত বা সিয়াম নয়; বরং সকল মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হলেই তা ইবাদত।

নববী সমাজে—

সালাত ছিল ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক শক্তি,

বাজার ছিল ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার স্থান,
আদালত ছিল জবাবদিহি ও ন্যায়বিচারের কেন্দ্র,

রাষ্ট্র ছিল কুরআনের আইন বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠান,

সমাজ ছিল নৈতিকতা, শালীনতা ও মানবিকতার পরিবেশ।

অর্থাৎ ইসলাম ব্যক্তিগত আচার নয়—একটি সম্পূর্ণ সভ্যতা ছিল।

এই নববী আদর্শ আজ পুনরুদ্ধার করতে হলে মুসলিমদের বুঝতে হবে যে ‘ধর্ম ব্যক্তিগত, রাষ্ট্র নিরপেক্ষ’—এই ধারণা ইসলামের নয়; এটি সেকুলারিজমের বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ।

ইসলামের লক্ষ্য—

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—এই চার স্তরকে একক দীনী কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করা।

কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ করার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধার হবে ইনশাআল্লাহ।

খ. শিক্ষা, পরিবার ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃস্থাপন

মুসলিম জাতির হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তিনটি বিষয়ের অপরিহার্যতা বাঞ্ছনীয়।
এক. যথার্থ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার, দুই, নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষতা অর্জন এবং তিন, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ।

সেকুলার প্রভাব সবচেয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। তাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধারের প্রথম বাস্তব ক্ষেত্র হলো—

শিক্ষা, পরিবার ও সমাজ।

১. শিক্ষা

শিক্ষা শুধু তথ্য দেওয়ার বিষয় নয়, বরং বিশ্বদৃষ্টি গঠনের প্রধান মাধ্যম। আজকের পাঠ্যক্রমে ইসলামকে কেবল একটি ‘ধর্মীয় বিষয়’ বানিয়ে ব্যক্তিগত সীমায় রাখা হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীসের উল্লেখ করেন যে, "ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ বা আবশ্যিকীয় বিষয়।" ধর্মীয় জ্ঞান পুত্রাণুপুত্রভাবে অর্জন করা ও ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের অন্যতম গুণাবলী। যথার্থ ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণই মানব জীবনের প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের উৎস। ধর্ম মানুষকে কতিপয় নীতি, মৌলিক কিছু মূল্যবোধ এবং মানুষের জীবন ও জগতের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম উৎকর্ষতা শিক্ষা দেয়। আর যিনি খাঁটি বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু তিনি অবশ্যই মানবজাতি ও অন্যান্য সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর উপাদান হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মতে, ধর্মীয় জ্ঞান একজন মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করে দেয়। আর এহেন পরিচয় জ্ঞানকেই প্রকৃত মারেফাত বলা হয়। মানুষের সাথে যদি তাঁর স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় না হয়, তবে সেই মানুষ স্বীয় প্রভুর আবদীয়্যাত বা দাসত্বের অনুভূতি দ্বারা রঞ্জিত হতে পারে না। আর আল্লাহর দাসত্ব বা গোলামীর অনুভূতিসম্পন্ন লোককেই বলা হয় মুসলিম বা সম্পূর্ণ অনুগত। যদি কোনো মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়, আশা, দয়া ও ক্ষমা প্রভৃতি অনুভূতিসম্পন্ন না হয় তবে সে হবে বেপরোয়া, স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য। তার ভিতরে যে সব পশু প্রবৃত্তি আছে-তা লাগামহীনভাবে জাগরিত হবে। অতঃপর উক্ত মানুষ মনুষ্যত্বের কোনো সীমানা দ্বারা সীমায়িত থাকবে না, বরং সে সভ্যতা ও শালীনতার যাবতীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করবে এবং অংহকারী, ধ্বংসকারী ও মানুষের অধিকার বিনষ্টকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তাই মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে হলে ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী তা পালন করতে হবে।

দ্বীন শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতিকে কুরআনিক দৃষ্টিতে পুনঃব্যাক্ষা করতে হবে। এটি সামাজিক চেতনা তৈরি করবে।

২. পরিবার

পরিবার হলো প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

— পিতা-মাতা সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামী আদর্শে জীবনযাপন করলে ঘরেই সন্তান ইসলামী মূল্যবোধ, চরিত্র, তাকওয়া ও দায়িত্বশীলতা শিখে। যুগের সাথে সাথে বাচ্চাদের সাইকোলজি ও পরিবর্তন হচ্ছে। তাই স্মার্ট প্যারেন্টিং শিখতে হবে।

পরিবার ভেঙে গেলে সমাজ সেক্যুলার হয়ে যেতে সময় লাগে না। প্রত্যেকটি পরিবার থেকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম চর্চা শুরু করতে হবে, তাহলেই সমাজ ও সেক্যুলারিজম মুক্ত হবে এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৩. সমাজ ও সংস্কৃতি

মিডিয়া, বিনোদন, জনপ্রিয় সংস্কৃতি—এসব বর্তমানে সেক্যুলার মূল্যবোধ বহন করছে। ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃস্থাপন করতে হলে—

সুস্থ বিনোদন, নৈতিক মিডিয়া, ইসলামী শিল্প-সংস্কৃতি এসবকে শক্তিশালী ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে।

পশ্চিমা যেই মিডিয়াকে ব্যবহার করছে ইসলামের বিরুদ্ধে সে মিডিয়াকেই ব্যবহার করতে হবে ইসলামের প্রচারের জন্য। মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মুসলিমদেরকে পশ্চিমা উপসংস্কৃতি পরিত্যাগ করে ইসলামের আপন সংস্কৃতি গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" এই ধরনের ভ্রান্ত মতাদর্শের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

গ. মুসলিমদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক পুনর্জাগরণ

শুধু আবেগ বা শ্লোগান দিয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ফিরে পাওয়া যায় না; প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক—দুই ধরনের পুনর্জাগরণ।

বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণ:

মুসলিম সমাজকে জানতে হবে— সেক্যুলারিজম কী?

কীভাবে এটি মুসলিম সমাজকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে?

কীভাবে ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি সেকুলার বিশ্বদৃষ্টির থেকে ভিন্ন ।

পাশ্চাত্যের এই ধরনের ফাঁদ গুলো থেকে নিরাপদ থাকার পূর্বশর্ত হলো গভীর থেকে পাশ্চাত্যকে চেনা। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। লিবারেলিজম, হিউমেনিজম, ফেমিনিজম সহ সকল পাশ্চাত্য ইজম নানা রং, আয়োজন ও আগ্রাসনের সাথে ঈমানের জন্য লুম্বিকি হয়ে আসতে থাকবে। তাই এই সমস্ত মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মুসলিমদের মানসিকভাবে সেকুলার করে দেয়; তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন—

সমালোচনামূলক চিন্তা, ইসলামী দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী অর্থনীতি, কুরআনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব। এই বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ছাড়া মুসলিম সমাজ কেবল আচারিক ধর্মের মুসলমান হয়ে থাকবে।

আত্মিক পুনর্জাগরণ:

বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ যেমন জরুরি, আত্মিক জাগরণ তেমনি অপরিহার্য।

তাকওয়া, ইখলাস, আল্লাহভীতি, জবাবদিহির অনুভূতি ছাড়া ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব।

সাহাবাদের সমাজ শক্তিশালী হয়েছিল—জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আত্মিক শক্তি—এই তিনের সমন্বয়ে। এই সমন্বয় পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আবারও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধার করা যাবে।

সর্বশেষ ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে, ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমেই ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধার হবে। এজন্য পৃথিবীর আনাচে কানাচে সমস্ত মানুষের কাছে দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপনের মাধ্যমে দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে।

অধ্যায় ৬: সেকুলারিজমের এই ফিতনাতে মুসলিমদের করণীয়:

কয়েক যুগ আগে থেকেই মুসলিমদের অনেকেই বুঝতে শুরু করেছে যে পুরো মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। প্রতিটি মুসলিম ফিতনাতুল মাগরিব(পশ্চিমা ফিতনায়) আক্রান্ত। অনেকেই একে মোকাবিলার চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ তারা এই চক্রান্ত ভালোভাবে বুঝতে পারছে না বা ভুল পন্থা অবলম্বন করছে।

আগেও বলেছি পাশ্চাত্যকে মোকাবিলা করার পূর্বশর্ত হলো গভীর থেকে পাশ্চাত্যকে চেনা।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

ইসলামের বন্ধন একটি একটি করে তখনই ছুটতে থাকবে, যখন ইসলামের মাঝে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা জাহিলিয়াতকে চিনবে না।

(মাজমুউল ফাতওয়া লি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. ১০/৩০১)

কারণ বান্দা যখন জাহিলিয়াত ও তার হুকুম সম্পর্কে জানব না তখনই সে অপরাধীদের পথকে মুমিনদের পথ মনে করবে। যেমনটা আমরা দেখি সেকুলারিস্ট মুসলিমদের ক্ষেত্রে। জাহিলিয়াত বা সেকুলারিজম সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণেই তারা ইলম, আমল ও ঈমানের ক্ষেত্রে কাফেরদের পথ ধরে চলছে এবং অন্যদেরকেও সেই পথে ডাকছে।

এজন্যই এই ফিতনাকে মোকাবিলা করার প্রথম ধাপ হলো নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। একই সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভালোভাবে বুঝা। এর প্রভাব এবং গভীরতা অনুধাবন করা। মুসলিম সমাজের ভেতরে দিনের প্রকৃত ইলম ও দাওয়াহ ছড়িয়ে দেওয়া। স্বচ্ছতা, সততা ও আমানতদারিতার সঙ্গে আপসহীন ভাবে হৃদয়গ্রাহী করে ইসলামের মৌলিক আদর্শ তুলে ধরা এবং প্রচার করার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করতে পারি।

একই সাথে মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হলো দ্বীনি কাজে মশগুল থাকা। বিশেষত আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের কাজে সময় ব্যয় করা।

আর যদি দাওয়াহ্ এবং জিহাদে লিপ্ত থাকতে না পারা যায় তাহলে খারাপ সঙ্গ পরিবেশ এবং মাধ্যম ত্যাগ করে চলা। সব মানুষ এবং পবিত্র স্থানের সংগ গ্রহণ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন থাকলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রীর বিনিময়ে তার দিন বিক্রি করে ফেলবে।
(সহীহ মুসলিম: ১১৮)

এই হাদিসে যে ফেতনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো ইরতিদাদ বা দ্বীন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফিতনা। তার বর্তমানে সেকুলারিজমের পাল্লায় পড়ে মুসলিমরা নিজেদের অজান্তেই দ্বীন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কাফের হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের প্রথম ইরতিদাদের আপনার সময় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বিতালের মাধ্যমে শক্ত হাতে ঐকে দমন করেছিলেন।

মুসলিম সমাজেও ইরতিদাদের এই স্রোত বন্ধ করতে হলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত ইরতিদাদের বলয় ভেঙে ফেলতে হবে কিতালের মাধ্যমে। পশ্চিমা বিশ্ব একটি দাঁত ছড়ানো এবং বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম দেশগুলোতে যে কাঠামো তৈরি করেছে, ক্বিতালের এর মাধ্যমে সেই কাঠামো ধ্বংস করতে হবে। তবেই মুসলিম সমাজ সেকুলারিজমের এই ফিতনা থেকে চূড়ান্তভাবে মুক্তি লাভ করবে।

কুরআন থেকে আমরা দেখেছি যখনই কোন জনপদ বা শহরের অধিবাসীরা আল্লাহর অবাধ্যতার সর্বোচ্চ মাত্রা অতিক্রম করেছে তখনই তাদের পতন হয়েছে। এবং তাদের বদলে পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায় আনতেন যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় কওমের ফেরাউন, কওমে লুত, কওমে শূয়াইব, কওমে আদ , কওমে সামুদ , কওমে সাবা , রোমান সভ্যতাসহ ৫০০০ বছরের ইতিহাসের প্রত্যেক অবাধ্য জাতি যেই সমস্ত গুনাহে লিপ্ত ছিল বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেই প্রত্যেকটি বিষয় একত্র হয়েছে। যেগুলো কিনা সেকুলারিজম এর বদৌলতে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন পুরো সেকুলার অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে সুদ ও প্রতারণার ওপর। যা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শামিল। এই সভ্যতায় আবিষ্কৃত হয়েছে যৌন বিকৃতির নানা প্রক্রিয়া; সমকামিতা, উভকামিতা, অজাচার, পশুকামিতা সহ নানান যৌনবিকৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাধীনতার মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।। ঐতিহাসিক বাস্তবতায় বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে অধঃপতনের দ্বারপ্রান্তে। সমাজের সংহতি পারিবারিক বন্ধন বলতে কিছুই আর নেই। নৈতিকতার চরম সংকটে চলিপূরে ভষ্ম হয়ে যাচ্ছে এই সভ্যতা। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি আজ মুখ খুবড়ে পড়ছে নানা দিক থেকে। সাম্রাজ্যের গোরস্থানখ্যাত আফগান ভূমিতে আজ নতুন ভাবে তাদের কবর রচনা হয়েছে। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, সমর শক্তি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি

নতজানু হয়ে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে খোঁরাসানের বাহিনীর সাথে। যে বাহিনীর হাত ধরে পৃথিবী জুড়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী সভ্যতা ইনশাআল্লাহ।

পৃথিবীতে আল্লাহর দিন আবার প্রতিষ্ঠা হবে এটা সুনিশ্চিত। এর আগে ঈমানের উপর চতুর্মুখী আঘাত আসবে। ঘন কালো ফিতনা বর্ষণ হবে; ইরতিদাদের ফেতনা, দাজ্জালের ফেতনা আসবে। বস্তুবাদী দর্শনের কবলে পড়ে মানুষ ঈমান হারাতে থাকবে। যারা ফেতনার সময় ইমানের উপর অটল থাকতে চাইবে, হাতে আগুনের অঙ্গুর তুলে নেওয়ার মতন সাহসী মনোবল থাকতে হবে তাদের। নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে পাঁচটা তো সভ্যতার আগ ভাঙ্গন থেকে মুক্ত করতে হবে। ঈমান সংরক্ষণের দায়িত্বের পর আরেকটি প্রধান দায়িত্ব হল ঈমান অনুযায়ী আমল করা। এই আমলের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলো ইসলামের বুনিয়াদী আমল। কিন্তু ইসলাম এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিগত আমলের পাশাপাশি ইসলামকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হল আগের সমস্যা চিহ্নিত করা তারপর সংশ্লিষ্ট সমাধানের পথে হাটা। পাশ্চাত্য যদি হয় ইতিহাসের ফিতনা, তাহলে মোকাবেলা করতে হবে শরয়ী মূলনীতি মেনে বুদ্ধিবৃত্তি ও আপোষহীন দাওয়াহর মাধ্যমে। পাশ্চাত্য যদি হয় ইরতিদাদের ফিতনা, তাহলে একে নির্মূল করতে হবে জিহাদ এবং ওয়ালা-বারা দিয়ে। আর এই সব কিছুর মূলে থাকবে আমাদের বিশুদ্ধ ঈমান। যে ঈমানে শুধু সেকুলারিজমের বিশ্বাসের মতো তাওহীদুর রুবুবিয়াতই থাকবে না, তাওহিদুল উলুহিয়া তাওহিদুল আসমা ওয়া সিফাতও সমানভাবে অবস্থান করবে। ঈমানের এই লড়াইয়ে প্রধান অস্ত্র হবে বিশুদ্ধ তাওহীদের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা আমাদের সহায় হোন। আমিন।

অধ্যায় ৭: উপসংহার

এই গবেষণার আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে সেকুলারিজম কোন নিরপেক্ষ বা অরাজনৈতিক ধারণা নয়; বরং এটি এমন এক জীবনদর্শন, যা সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্মের অবস্থানকে পরিকল্পিতভাবে সংকুচিত করে। পশ্চিমা ইতিহাসে সেকুলারিজম জন্ম নিয়েছিল চার্চের জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে, কিন্তু মুসলিম

সমাজে তা প্রবেশ করেছে অন্য পথে—বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব, শিক্ষার উপনিবেশীকরণ, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং ধর্মের “আধুনিক ব্যাখ্যা” নির্মাণের মাধ্যমে।

মুসলিম সভ্যতার মূল শক্তি ছিল একত্ববাদী বিশ্বদৃষ্টি—যেখানে ইবাদত, নৈতিকতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সমানভাবে আল্লাহর নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেকুলারিজম সরাসরি সেই কেন্দ্রটিকেই আঘাত করে। এটি মুসলিমকে মসজিদের ভেতরে ধর্মীয় করে তোলে, কিন্তু মসজিদের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাধারা গ্রহণ করাতে শেখায়। ফলে দ্বীন ইসলাম ব্যক্তিগত আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়; আর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সেকুলার মূল্যবোধে।

এ গবেষণায় দেখা গেছে, সেকুলারিজমের সবচেয়ে সূক্ষ্ম কৌশল হলো ধর্মকে অস্বীকার করা নয়, বরং ধর্মকে “ব্যক্তিগত” বলা। এই ধারণার মাধ্যমে ইসলামকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে শুধু হৃদয় ও ঘরের কোণে আটকে রাখা হয়। মুসলিম সমাজে “মডারেট ইসলাম”, “নৈতিক ইসলাম”, “সেকুলারিস্ট মুসলিম”—এর মতো নতুন ব্যাখ্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে ঠিক এই উদ্দেশ্যে—যাতে ইসলাম নামমাত্র টিকে থাকে, কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা অদৃশ্য হয়ে যায়।

সুতরাং এ গবেষণার প্রধান ফলাফল হলো—

সেকুলারিজম মুসলিম সমাজে প্রাথমিকভাবে ধর্মবিরোধী আন্দোলন নয়, বরং ধর্মকে ব্যক্তিগত করে রাখার এক গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ। তবে ধীরে ধীরে এটি মানুষকে ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধী করে তোলে।

এখানে রাষ্ট্র আলাদা, আইন আলাদা, রাজনীতি আলাদা, অর্থনীতি আলাদা—শুধু ব্যক্তিগত জীবনে কিছু আচার-অনুষ্ঠান ইসলামি থাকে।

ইসলামকে ব্যক্তিগত করার এই প্রবণতা কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ ইসলাম কেবল কিছু আধ্যাত্মিক বিধান নয়—বরং এটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ থেকে রাষ্ট্র—সবকিছুকে আল্লাহর নির্দেশের আলোকে পরিচালিত করতে চায়।

অতএব ভবিষ্যৎ মুসলিম সমাজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো—

ইসলামের সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সভ্যতাগত ভূমিকা পুনরুজ্জীবিত করা;

এবং সেক্যুলারিজমের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা পুনরুদ্ধার করা।
এই সত্য উপলব্ধি করাই এই গবেষণার চূড়ান্ত উপসংহার—
ইসলাম ব্যক্তিগত ধর্ম নয়; এটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আর সেক্যুলারিজম সেই পূর্ণতাকেই
ভেঙে ব্যক্তিগত পরিসরে আটকে ফেলার সূক্ষ্ম কৌশলের নাম।

রেফারেন্স:

১.ডিভাইড বিটুইন ইসলাম এন্ড সেকুলারিজম বই

২.হিউম্যান বিয়িং বই

৩.<https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10668>

৪.

<https://dailyinqilab.com/islam-peace-prosperity/article/700154>

৫.<https://www.juniv.edu/journal/11271/file>

৬. উইকিপিডিয়া

৭.মুসলিম নসিহা এপস